জীবন জাগার গল্প-৫
আকাশের
ঝিলিমিলি
তারা
মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

আকাশের ঝিকিমিকি তারা

জীবন জাগার গল্প

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

শুরুর কথা

*** আচ্ছা, গল্প পড়ে কি জীবন বদলানো যায়? আরেক জন উদাসী বাউল সুরে প্রশ্ন:

-ভাই! গল্প পড়ে কি জীবনকে জাগানো যায়? কোথাও দেখেছেন? গল্প দিয়ে যদি জীবনকে জাগানো যেত, আর স্কুল কলেজ-মাদরাসার প্রয়োজন হতো না।

-কেন ভাই, আপনি বড় বড় মানুষদের জীবনী পড়েন নি?

-হ্যাঁ, পড়েছি। তো কী হয়েছে?

-তাদের জীবনটাই তো একেকটা জীবন্ত গল্প।

*** ধর্মীয় পরিমণ্ডলের গল্পগুলো সাধারণত আমলনির্ভর হয়ে থাকে। অর্থাৎ গল্পগুলো পড়ে যাতে ভেতরে আমলের প্রতি উৎসাহ জাগে, এমন গল্পই বেশি প্রচলিত।

*** যে গল্পগুলো পড়লে মানবিক সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে এমন গল্প অতটা প্রচলিত নয়। গুটিকয়েক গল্পই শুধু প্রচলিত আছে।

*** আমাদের সুপ্ত একটা বাসনা, আমাদের এই গল্পগুলোর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর দিকগুলো জাগ্রত করা।

*** কয়েকজন অমুসলিমকেও আমরা গল্পগুলো পড়তে দিয়েছিলাম। তাদের কাছেও ভালো লেগেছে। এমনকি একজন বৌদ্ধ খুবই উৎসাহব্যঞ্জক অনুভূতি প্রকাশ করেছে।

*** কিছু গল্প আছে, যেগুলো বিদেশি পটভূমিতে রচিত। সেগুলোকে বাংলায় রূপান্তর করলে গল্পের রসটা বাকি থাকে না। আর কিছু গল্প আছে বিদেশি ভাষার সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। বিশেষ করে আরবি ভাষায়। এই গল্পগুলো খুবই সুন্দর। কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করার মতো নয়। করলে ভাষার সৌন্দর্য ছিলো ওটা আর থাকবে না। এমন বেশ কিছু গল্প আমাদের সংগ্রহে আছে। আমরা ভেবে দেখছি, কিভাবে ভাষারস অক্ষুন্ন রেখে, গল্পগুলো রূপান্তর করা যায়।

*** আমরা আমাদের আশেপাশের ভাইদেরকে বলেছিলাম, আপনাদের জানার আওতায় যদি কোনও সুন্দর ও শিক্ষণীয় গল্প থাকে, আমাদেরকে দয়া করে জানান, আমরা সেগুলো সবাইকে জানানোর ব্যবস্থা করবো। কিছু ভাই এই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। আমরা গল্পগুলো জমা করে রেখেছি।

*** কল্পনাশক্তি মানুষের অন্যতম শক্তি। এই কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প লেখাও সম্ভব। কিন্তু সবার কল্পনাশক্তি এক রকম নয়। আমাদের ইচ্ছা, বাংলা ভাষায় যাদের বেশ দখল আছে, যারা চাইলেই ভাল কিছু লিখতে পারেন, তারা যদি এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন, তাহলে আমাদের সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

*** মাঝে মাঝে ভাবনা জাগে, আমরা তো ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে গল্পগুলো লিখছি। কিন্তু এগুলোর কোনও নেতিবাচক প্রভাব নেই তো? এটা আগে কখনো মাথায় আসে নি। একজন বলার পরই শুধু ভাবনায় এলো, তাই তো! আমরা ভাল বললেই তো একটা গল্প ভাল হয়ে যাবে না। অন্যদের কাছে তো গল্পটা নেতিবাচক শিক্ষাও নিয়ে যেতে পারে!

*** একজনের প্রশ্ন:

– ভাই, গল্পের বইগুলোতে ভাষাগত অনেক ভুল আছে। এটা খেয়াল করেন না কেন?

-এ বিষয়টা খেয়াল করার চেষ্টা করি। আমাদের সামর্থ যতটুকু আছে, ততটুকুই। ভুলভাল যা থাকে সেটা আমাদের অযোগ্যতার কারণেই থেকে যায়।

-তাহলে ভালো কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন?

-জ্বি ভাই, সে চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। তেমনি একজন গল্পগুলোও ওপর এমনভাবে কলম চালালেন যে, কোনোটাতে গল্পের মূল সুরটাই নাই হয়ে গেলো। কোনও গল্প ছিলো এক পৃষ্ঠার, কিন্তু সম্পাদনার পর হয়ে গেলো চার পৃষ্ঠা। বেশির ভাগ গল্পই ছিলো সাদামাঠা ভাষায়, কিন্তু তিনি এমন অভিধানঘেঁষা শব্দ বসিয়ে দিলেন যে, পাঠক প্রতি লাইনে লাইনে কম করে হলেও পাঁচবার অভিধান নিতে হবে। কোনও গল্প ছিলো খুবই সরল-সহজ, কিন্তু তিনি এমন 'ভাব' আমদানি করলেন যে, সেটা গল্প না হয়ে দর্শনের রসকষহীন একটা তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।

- না, তাহলে কাউকে না দেয়াই বোধহয় ভাল হয়েছে।

*** আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা সব সময় কায়মনোবাক্যে দু'আ করে আসছি, আমাদের এই সামান্য মেহনত যেন তিনি কবূল করে নেন। এই মেহনতের সাথে যারা জড়িয়ে আছে, তাদেরকেও যেন তিনি কবূল করে নেন।

সূচী পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৩২৫

হারানো বিজ্ঞপ্তি

রাস্তার পাশে একটা গাছে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে:

"আমি বিশটা টাকা হারিয়ে ফেলেছি। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে, দয়া করে নিচের ঠিকানায় পৌঁছে দেবেন।

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা। ওই বিশটা টাকা ছাড়া চাল কেনার মতো আমার কাছে আর কোনও টাকা নেই। চোখেও দেখি না"।

এক যুবক বিজ্ঞপ্তিটা দেখলো। তার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে ঠিক করলো, টাকাটা সে পেয়েছে বলে দাবি করবে।

ঠিকানা মিলিয়ে বৃদ্ধার ঘরে গেলো।

-বুড়িমা! টাকাটা আমি পেয়েছি।

বৃদ্ধা কেঁদে দিলেন। বললেন:

-এই পর্যন্ত তুমিসহ দশজন মানুষ এসে দাবি করলো, সেই টাকাটা পেয়েছে। সবাই এসে টাকাটা দিয়ে গেছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সবাই এসে কিসের টাকা দিয়ে যাচ্ছে?

-কেন গলির মোড়ে গাছের সাথে ঝোলানো বিজ্ঞপ্তিটা আপনি লাগান নি?

-কই না-তো? আমি তো লিখতেই পারি না। চোখেও ভালো দেখি না। আর আমি তিনদিনের উপোস। টাকাই নেই, আবার হারাবো কোথেকে? টাকা থাকলে কি আর তিনদিন উপোস থাকি?

তুমি বাছা! এক কাজ করো, মোড়ে গিয়ে বিজ্ঞপ্তিটা ছিঁড়ে ফেলো। ওটা আমি লাগাইনি।

আর শোন! এলাকাবাসীর মহানুভবতায় আমি কৃতজ্ঞ। আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে এখনো ভালো মানুষ আছে। এটাই আমাকে বেঁচে থাকার আশা যোগাচ্ছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩২৬

জাপান কেন এমন

এক

জাপানে শিশু শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পযন্ত শিশুরা একটা বিষয় পড়ে তার নাম 'চলো ভদ্রতা শিখি'। এই ক্লাসে ছাত্ররা শেখে কিভাবে অন্যের সাথে কথা বলতে হবে, কিভাবে অন্যের সাথে ওঠাবসা করতে হবে, কিভাবে বাবা-মার সাথে থাকবে, কিভাবে স্কুলে ও সব জায়গায় থাকতে হবে ইত্যাদি।

দুই

জাপানে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ছাত্রদেরকে দীক্ষাদান, তাদের বুঝশক্তি বাড়ানো ও তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন। মুখস্থ বিদ্যা বা তোতাপাখির মতো আওড়ানো নয়। এজন্য প্রথম শ্রেণী থেকে নিম্ন মাধ্যমিকের তৃতীয় ক্লাশ পর্যন্ত পাশ ফেলের কোনও ব্যাপার নেই।

তিন

জাপানীরা বিশ্বের অন্যতম ধনী হলেও তাদের অধিকাংশের বাড়িতেই চাকর নেই। বাবা-মা আর সন্তানরাই ঘরের যাবতীয় কাজ করে। ছাত্ররাই শিক্ষকদের সাথে প্রতিদিন পনের মিনিট করে স্কুল-কলেজ পরিষ্কার করে। এতে ছেলেবেলা থেকেই তাদের মনে পরিচ্ছন্নতার প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়।

চার

শিশুরা স্কুলে যাওয়ার সময়ও দাঁত ব্রাশ নিয়ে যায়, কিছু খেলে তারা সাথে সাথে সেখানেই দাঁত ব্রাশ করে নেয়। শিক্ষকরাও এটা তদারক করেন। এতে শিশুরা শুরু থেকেই সুস্থতার প্রতি মনোযোগ দিতে শেখে।

পাঁচ

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা ছাত্রদের খাবারই নিজেরা খান। সেটা তারা করেন ছাত্রদের খাবার গ্রহণের আধাঘণ্টা আগে। যাতে কোনও সমস্যা ধরা পড়লে সংশোধন করা যায়। পরিচালকদের জন্য আলাদা কোনও খাবারের ব্যবস্থা থাকে না।

ছয়

জাপানের ছেলে-মেয়েদেরকে সবসময় একটা বিষয় তাদের মাথায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়:

তোমরাই জাপানের ভবিষ্যত। তোমরা ঠিকমতো গড়ে উঠলে জাপান ঠিক থাকবে।

সাত

জাপানে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর অনেক সম্মান। তাদের'কে ডাকা হয় 'স্বাস্থ্য প্রকৌশলী' নামে। এই চাকুরিতে নিয়োগ পাওয়ার আ গ তাদেরকে কঠিন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। তাদের গড় বেতন হয় সাড়ে সাত হাজার থেকে আট হাজার মার্কিন ডলার।

আট

ট্রেন, রেস্তোরাঁ এবং বদ্ধ পরিবেশে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমনকি জাপানে মোবাইলের সাইলেন্ট মুডের নামই রাখা হয়েছে 'আখলাক' বা সচ্চরিত্র নামে।

নয়

জাপানীরা কোনও বুফে বা সম্মিলিত খাবার অনুষ্ঠানে গেলে, সবাই যার যতটুকু খাবার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তার প্লেটে নেয়। ফলে খাবার শেষে দেখা যায় কারো প্লেটেই উচ্ছিষ্ট খাবার নেই।

দশ

জাপানে ট্রেন আসতে বা ছাড়তে বিলম্বের হার দশ বছরে গড়ে সাত সেকেন্ড। জাপানীরা শুধু ঘন্টা বা মিনিট নয় সেকেন্ডকেও সর্বোচ্চ মূল্য দেয়।

জীবন জাগার গল্প : ৩২৭

বাজের রূপান্তর

সিনাই উপত্যকা। জেনারেল আদিল সালাহির কাছে রিপোর্ট এল সৈন্যরা একটানা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। তাদের উদ্যম ফিরিয়ে আনতে দ্রুত কিছু করা প্রয়োজন। জেনারেল ব্যারাকে থাকা সৈন্যদেরকে একত্র হওয়ার আদেশ দিলেন। তিনি প্রস্তুতি নিয়ে নিজেই তাদের কাছে গেলেন। বক্তব্যের ঢঙে বললেন:

-আমরা ৬৭ সালে আমাদের সিনাই ইহুদিদের কাছে হারিয়েছি। এবার (৭৩ সাল) আর হারাতে চাইনা। যে কোনও মূল্যে আমরা এখান থেকে ইহুদিদেরকে হটিয়েই ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।

ক্লান্তি-অবসাদ সবার মধ্যেই আসে। শুধু মানুষ কেন, পশু-পাখির মধ্যেও আসে। এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। আমি তোমাদেরকে শুধু একটা পাখির কথা বলবো। তোমরা জানো আমার একটা বাজ আছে।

-জ্বি স্যার।

-বাজপাখিটা আমার খুবই প্রিয়। এ কারণে আমি বাজ নিয়ে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছি। তোমরাও জেনে রাখো, মনে সাহস ও উদ্যম ফিরে পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

* একটা বাজপাখি সাধারণত সত্তর বছর বাঁচে। কিন্তু তোমরা কি জানো, এই সত্তরের কাছাকাছি বয়েসে পৌছতে বাজকে তার মাঝবয়েসে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়?

-জ্বি না, স্যার।

-একটা বাজ যখন চল্লিশ বছর বয়েসে পৌছে, তখন তার নখরগুলোর ধার কমে যায়। সেই ভোঁতা নখরগুলো দিয়ে শিকার ধরাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে তো তাকে না খেয়ে মরতে হবে। কারণ বাজের নখরগুলোই তার জীবিকার উৎস।

* এই বয়সে পৌছে তার শক্তিশালী চঞ্চু বা ঠোঁটও অনেক বেশি বেঁকে যায়। এমনিতে তো বাজের ঠোঁট বাঁকানো থাকে, দীর্ঘদিন শিকার ধরতে ধরতে চঞ্চুটাও তার কর্মক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলে।

* দীর্ঘ দিন আকাশে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে বাজের দুই ডানাও ভারী আর দুর্বল হয়ে পড়ে। ডানার পালকগুলো ভারী হয়ে পড়ে। পালকগুলো ক্রমশঃ বুকের সাথে লেপ্টে যেতে থাকে। দিন দিন আকাশে ওড়াটা কঠিন থেকে কঠিন হতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে বাজেরা কী করে?

-বাজের সামনে তখন দুইটা পথ খোলা থাকে

ক. পরিস্থিতির শিকার হয়ে, নিজেকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেয়া। আস্তে আস্তে অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

খ. নিজেকে পরিবর্তনের কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ নেয়া।

* বাজেরা দ্বিতীয় পথটাই বেছে নেয়। তারা নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করে, জীবন বাঁচাতে (প্রায়) ১২০ দিনমেয়াদী একটা যন্ত্রণাকর কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

* এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাজগুলো গভীর বনে বা সুউচ্চ কোনও পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়। এমনিতেই বাজেরা তাদের বাসাও বানায় পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়।

১. প্রথমেই শক্ত কোনও পাথরের সাথে জোরে ঠোকর দিয়ে দিয়ে বেঁকে যাওয়া চঞ্চুটা ভেঙে ফেলে। শত যন্ত্রণাতেও পিছু হটে না। এরপর কিছুদিন অপেক্ষা করে। আস্তে আস্তে চঞ্চুটা নতুন করে গজায়।

২. তারপরে দুই থাবার নখরগুলো আগের মতো পাথরে আঘাত করে করে ভেঙে ফেলে। এরপর অপেক্ষা করতে থাকে। এক সময় নখরগুলো নতুন করে গজায়।

৩. তারপরে ঠোকর দিয়ে দিয়ে শরীরের সমস্ত পালক ঝরিয়ে ফেলে। আবার শুরু হয় অপেক্ষার পালা। কিছুদিন পর শরীরে আবার নতুন করে পালক গজিয়ে ওঠে।

* একটা বাজকে সর্বোচ্চ পাঁচ মাস এই যন্ত্রণাকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

এরপর, পাহাড়ের ঘাঁটি ছেড়ে, নতুন আরেক বাজ হয়ে আকাশে উড়াল দেয়। সম্পূর্ণ নতুন এক বাজ। উদ্যম-উৎসাহে টগবগ করতে থাকা এক বাজ। নতুন করে বাঁচার আনন্দে চনমন করতে থাকা এক বাজ।

প্রিয় সৈনিকেরা! তোমরা জানো ৬৭ সালে ইহুদিরা আমাদের সাথে কী আচরণ করেছে। আমাদের কিছু ভাইয়েরা (ইখওয়ানুল মুসলিমীন) কী অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করেছিলো। কিন্তু তারপরও কিছু মানুষের গাদ্দারীর কারণে আমরা সেবার হেরে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আমরা আসলে পরাজিত হইনি। কৌশলগত পিছু হটেছিলাম মাত্র। আমরা বাজের মতো প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সামান্য আত্মগোপনে গিয়েছিলাম।

এসো আমরা আগমীকালই পবিত্র কুদসের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

না'রায়ে তাকবীর! আল্লাহু আকবার।

জীবন জাগার গল্প : ৩২৮

স্বপ্নের হাজী

হজ শেষ। এবার ফেরার পালা। জেদ্দা বিমান বন্দরে শত শত হাজী সাহেবান অপেক্ষমান। ডা. ইমতিয়াজ খালিদও একটা আসনে বসে আছেন। নিজ ফ্লাইটের জন্য বসে আছেন। ডা. খালিদ একজন ডাক্তার। পাকিস্তানের পেশাওয়ারের অধিবাসী। তিনি বসে বসে ছোট্ট একটা বুকলেট পড়ছেন। মদীনায় অবস্থানকালে একজন দেশি ভাই বইটা ধরিয়ে দিয়েছেন। ফ্রি বিতরিত বই। আগ্রহ বোধ না করলেও 'কী আছে দেখি' মনোভাব নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করলেন।

এমন সময় একজন লোক এসে পাশে বসলেন। বসেই জানতে চাইলেন:

-ভাই বুঝি পাকিস্তান থেকে এসেছেন?

-জ্বি, কিভাবে বুঝলেন?

-ওটা তো সোজা, আপনার হাতে উর্দু কিতাব দেখে!

-ও হাঁ, তাই তো। বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি।

আগন্তুক লোকটা নিজের পরিচয় দিলেন:

-আমি হাসান শাহেদী। আপনি তো হজে এসেছেন?

-জ্বি। আল্লাহর অশেষ কৃপায়, অনেক কান্না আর তামান্নার পর অবশেষে হজ করার তাওফীক হলো।

হাসান শাহেদী গর্বভরে বললো:

-আমি এবার সহ দশবার হজ করলাম। হজে আসতে আমার ভালো লাগে। কিছু ব্যবসাপাতিও হয়, আবার মানুষও বেশ সম্মানের চোখে দেখে। আপনি কিভাবে হজে এসেছেন?

ডা. খালিদ বললেন:

-আমার হজের পেছনে ভাই বিরাট কাহিনী।

-আচ্ছা! বলুন তো শুনি।

-পুরো ঘটনা খুলে বলতে অনেক সময় লাগবে।

-আরে ভাই, আমাদের বিমানের সময় হতে এখনো অনেক দেরি। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

-তাহলে শুনুন। আমাদের পুরো বংশটাই হাজী বংশ বলতে গেলে। আমি মেডিকেল কলেজ থেকে বের হয়েছি প্রায় ত্রিশ বছর আগে। তখন থেকেই চেষ্টা করে আসছিলাম। টাকা জমাতে শুরু করেছিলাম। আমাদের পরিবার অনেক বড়। অনেকের খরচ আমাকেই চালাতে হয়। সেজন্য আয়-রোজগার ভালো হলেও মাস শেষে কিছুই জমতো না। তারপরও অল্প অল্প করে টুটাফাটা কিছু জমছিলো।

আমি চাকুরি করি পেশোয়ারে অবস্থিত কায়েদে আ'যম হেলথ কেয়ার সেন্টারে। গত বছর রমজানের আগে, মাসশেষে বেতন তুলতে গিয়েছি। একজন মহিলা এসে পাশে দাঁড়ালেন। প্রথমে খেয়াল করতে পারিনি। বেতন তুলেই চলে আসছিলাম। পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম আমার এক রুগির মা। রুগি ছেলেটা এখনো হাসপাতালেই ভর্তি আছে, ছেলেটার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। হাঁটাচলা করতে পারে না। মা সার্বক্ষণিক পাশে থেকে সবকিছু করে দেন। মহিলা বললেন:

-ভাইসাব! ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক আন্তরিকভাবে আমার ছেলেটার চিকিৎসা করেছেন। আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমি মহিলার চেহারায় বেশ কষ্ট আর বিষণ্ণতার ছাপ দেখতে পেলাম। আমি ভাবলাম, আমাদের চিকিৎসায় মহিলা বোধহয় সন্তুষ্ট হতে পারছে না। তাই আমি বেশি কথা বাড়ালাম না।

হাসান শাহেদী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো:

-মহিলা তো আপনার চিকিৎসা ও পরিশ্রমের প্রশংসাই করলো। তবুও ছেলেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে কেন?

-আমিও তখন এ বিষয়টা মেলাতে পারছিলাম না। আমি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিলাম। জানতে পারলাম, মহিলার মানে রুগির বাবা হঠাৎ করে চাকুরি হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর চিকিৎসা খরচা চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা জানতে পেরে আমি পরিচালকের কাছে গেলাম। তাকে অনুরোধ করলাম যেন হাসপাতালের খরচে ছেলেটার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তিনি রাজি হলেন না। তিনি বললেন:

-ডা. খালিদ! এটা একটা ব্যবসায়িক ক্লিনিক, কোনও দাতব্য হাসপাতাল নয়।

আমি বের হয়ে এলাম। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। টাকার অভাবে একটা মাসুম বাচ্চার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

আমি আনমনে হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে হাঁটছিলাম। ভাবছিলাম কী করা যায়? মোবাইলটা নেয়ার জন্য পকেটে হাত দিলাম। পকেটে রাখা আমার একাউন্টের চেকবইটায় হাত লাগলো। বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মাথায় এলো:

-ব্যাংকে তো হজে যাওয়ার জন্য জমিয়ে রাখা টাকাটা পড়ে আছে। সেগুলো তোলার জন্যই চেকবইটা সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। আমি আর চিন্তা করলাম না। মনে মনে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে বললাম:

-ইয়া আল্লাহ! আপনি তো জানেন, বাইতুল্লাহর যিয়ারত আমার কতখানি প্রিয় বিষয়। নবীজির রওযা মুবারক যিয়ারতের আগ্রহ কতটা প্রবল! আমি কতটা কষ্ট করে, তিলতিল করে এই টাকাটা জমিয়েছি তাও আপনি জানেন। পাক্কা নিয়ত করেছিলাম এবারে হজে যাওয়ার জন্য টাকা জমা দেব। কিন্তু সেটা ঠিক রাখতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলে, একাউন্টে জমা দিলাম। বললাম:

-ওই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলেটার চিকিৎসা চলবে। তাকে রিলিজ দেয়া যাবে না। পুরো চিকিৎসার ব্যয়টাই আমি অগ্রিম জমা করে দিলাম।

ছেলেটার মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম:

-হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের বিশেষ ফান্ড থেকে তার ছেলের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হয়েছে।

ছেলের মা অনেক দু'আ করলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে অনেক কথা বললেন।

হাসান শাহেদী বললো:

-টাকা তো চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে গেছে, তো এখন হজে কিভাবে এলেন?

-আরে সবুর করুন না। সেটাই তো এখন বলতে যাচ্ছি।

ছেলেটার চিকিৎসা ব্যয় মিটিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এলাম। রাতে শোয়ার সময় হজের ভাবনাটা ফিরে এল। একটু আফসোস হতে লাগল। ইশ! এতদিন ধরে জমানো টাকা দিয়ে হজ না করে, আরেকজনকে দিয়ে দিলাম? পরক্ষণেরই আবার সান্ত্বনা ফিরে পাচ্ছিলাম, একজন অসহায় মায়ের মুখে তো হাসি ফোটাতে পেরেছি। এ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যেও আমি হজের মায়ায় কাঁদছিলাম। দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছিলো। শেষ রাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখলাম।

=আমি কা'বার চারপাশে তাওয়াফ করছি। আশেপাশের লোকেরা আমাকে বলছে, আপনার হজ বরকতময় হোক। আপনি দুনিয়াতে হজ করার আগে আকাশে হজ করেছেন।

চট করে ঘুম ভেঙে গেল। মনটা খুবই আনন্দিত ছিলো। মনে হচ্ছিলো আমি হজ করে এসেছি। যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম, টাকা যোগাড় করে আর হজে যাওয়া হবে না। তারপরও আমি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট ছিলাম।

সকাল বেলা নাস্তা সেরে অফিসের দিকে রওনা দেয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠলো। ফোন ধরেই দেখি, আমাদের হাসপাতালের পরিচালক কথা বলছেন। তিনি বললেন:

-আপনাকে একটা কাজ করতেই হবে। আপনি না না বললেও আমি শুনবো না।

-কাজটা কি স্যার?

-পেশোয়ারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী হজে যাবেন। তিনি গুরুতর হার্টের রুগি। ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি হজে যাবেনই। তিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে সাথে করে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সেই চিকিৎসক যেতে পারছেন না। তার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, তাই তাকে একা রেখে যেতে চাচ্ছেন না। এখন আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করেছি। আপনাকেও সেই ব্যবসায়ীর সাথে হজে যেতে হবে। সব খরচা অবশ্য ব্যবসায়ীই বহন করবেন।

-ঠিক আছে স্যার, আমি রাজি। এমন সৌভাগ্য কেউ হাতছাড়া করে?।

ডা. খালিদ বললেন:

-ভাই হাসান! আপনি এখন দেখতেই পাচ্ছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোনও খরচা ছাড়াই হজের বন্দোবস্ত কর দিয়েছেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা হল, সেই ব্যবসায়ী আমাকে অতিরিক্ত আরো বেশ মোটা অংকের টাকা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

-আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করছেন। আপনি সাথে না থাকলে আমার হজে আসা হতো না, হয়তো। আপনি যেভাবে আমার সব দিক লক্ষ্য রেখেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এলে এতটা হতো না।

-না না, আমি শুধু আমার দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করেছি। আপনি আমাকে যে হাদিয়া দিতে চাচ্ছেন, সেটা আমার প্রয়োজন নেই।

এরপর আমি তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম। ত্রিশ বছর ধরে টাকা জমানো থেকে শুরু করে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলের কথা, হজের জন্য জমানো টাকা দিয়ে তার চিকিৎসা ব্যয় বহন করার কথা ইত্যাদি।

ব্যবসায়ী পুরো ঘটনা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন:

-ভাই! আপনার হজের ব্যবস্থা সরাসরি আল্লাহই করেছেন। আর আপনার মতো একজনের সাথে আমাকে হজ করার তাওফীক দিয়েছেন, এজন্য আমি কিভাবে যে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করি!।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আগের ফ্লাইটে চলে গেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

-অসুস্থ ছেলেটার আগে-পরের সমস্ত চিকিৎসা ব্যয় তিনি বহন করবেন। আর এ ধরনের গরীব-অসহায়দের চিকিৎসার জন্য একটা ফান্ডও তৈরি কর দিবেন।

পুরো ঘটনা শুনে হাসান শাহেদী বলে উঠলো:

-আল্লাহু আকবার! আমি আপনার সামনে বসে থাকতে যতটা লজ্জা পাচ্ছি জীবনে আর কখনো এতটা লজ্জা পাই নি। ভাই, আমি একের পর এক হজ করে গেছি, দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে। লোক দেখানোর জন্য। আপনার এই একটা হজের কাছে আমার এতগুলো হজ কিছুই না। আপনি একটু দু'আ করেন, আল্লাহ যেন আপনার মতো একবার হজ করার তাওফীক দান করেন।

জীবন জাগার গল্প : ৩২৯

কেরামতি

কথা বলছিলাম ছোট ভাই মনসুরের সাথে। সে কারামত নিয়ে দু'টো গল্প শোনাল।

-আমি তখন দারুল মা'আরিফে পড়াশোনা করি। থাকি শায়খুল হাদীস এহসানুল হক সাহেব (রহ.) হুযুরের কামরায়। খাঁটি আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ। মুত্তাকী। হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের সম্মানিত পিতা। আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেবের উস্তাদ।

এহসানুল হক সাহেব হুযুর একবার মনসুরকে একটা ঘটনা শোনালেন। তিনি বললেন:

-এই যে বুযুর্গগণের বিভিন্ন কারামাত প্রকাশ পায়, সেটা কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই অলৌকিক কোনও শক্তিবলে হয় না। তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে, তারা অনেক সময় কিছু বিষয় প্রকাশ করেন, তা দেখে সাধারণ মানুষ ভেবে বসে:

-বাব্বাহ! হুযুরের কেরামতি দেখছেন?

হুযুর বললেন:

-আমি একবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসছি। কী কারণে যেন যাত্রীদের প্রচণ্ড ভীড়। কোথাও কোনও সিট পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে, শেষ পর্যন্ত ট্রেনের দুইটা টিকেট পাওয়া গেলো। আমরা ঠেলেঠুলে নির্দিষ্ট বগিতে উঠলাম। আমরা ছিলাম দুইজন। জায়গামত গিয়ে দেখি আমাদের আসন পড়েছে একেবারে 'মানুষ চলাচলের রাস্তায়'।

আমাদের পাশেই জানালার ধারে একজন যুবক বসে ছিলো। আমি বৃদ্ধ মানুষ, কষ্ট হবে মনে করে, আমার সফরসঙ্গী যুবককে বিনীতভাবে অনুরোধ করলো

-ভাই, এই মুরুব্বীকে জানালার পাশে একটু বসতে দেয়া যাবে?

যুবক ভ্রু-কুঞ্চিত করে বললো:

-না, ওনাকে ওনার সীটে বসতে বলুন।

হুযুর বললেন:

-ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি বসে বসে যিকির করতে থাকলাম। আমরা দু'জন আর যুবকের মাঝে প্রথমে একটু আড়ষ্ট ভাব ছিলো, পরে আস্তে আস্তে কিভাবে যেন কেটে গেল। এক পর্যায়ে আমি যুবককে বললাম:

-আপনি বোধ হয় কক্সবাজার যাবেন।

-জ্বি।

-আপনি বোধহয় ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন?

-জ্বি।

-আপনার বাবা তো একজন শিক্ষক তাই না?

-জ্বি।

-আপনি জন্মগতভাবেই খৃস্টান নাকি ধর্মান্তরিত?

-হুযুর আপনি কিভাবে এতকিছু জানলেন?

একথা বলেই যুবকটা তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল।

আমার পা চেপে ধরে বললো- হুযুর, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারি নি। বেয়াদবি করে ফেলেছি।

এরপর ছেলেটা পুরো রাস্তা আমার পাশে বসতেই চাইল না। সে দাঁড়িয়েই থাকল।

এখন বলতো মনসুর! আমি এতকিছু কিভাবে বললাম? অলৌকিক কোনও শক্তিতে? না, আমি আসলে বাহ্যিক কিছু আলমত দেখেই ব্যাপারগুলো আঁচ করে নিয়েছি।

ছেলেটার ব্যাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা। ছেলেটার মাথায় একটা বার্মিজ ক্যাপ ছিলো। গলায় ছিলো একটা ক্রুশ। আর কিছু লাগে? তবে হ্যাঁ ওর বাবার শিক্ষক হওয়ার বিষয়টা আমি অনেকটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছি। আবার পুরোপুরি আন্দাজেও নয়। শিক্ষকরাই সাধারণত, প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকলেও ছেলেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আগ্রহী হন।

মনসুর! শোন তাহলে কারামতের আরেকটি গল্প:

-আমার এক মুরীদ আছে। সে অনেক দিন ধরেই আমাকে খাবারের দাওয়াত দিয়ে আসছিলো। আমি সময় করে উঠতে পারছিলাম না। তার পীড়াপীড়িতে আর থাকতে না পেরে বললাম, ঠিক আছে আমার তো এখন বাসায় গিয়ে দাওয়াত খাওয়ার সময় নেই, তুমি এক কাজ করো, খাবার-দাবার রান্না করে মাদরাসাতেই নিয়ে এসো।

সে কয়দিন পর খাবার নিয়ে এল। আমি হাঁসের গোশত মুখে দিয়েই বললাম:

-উঁহু! গোশতে তো ড্রেনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গোশত ভাল করে ধোয়া হয়নি?

-ইন্নালিল্লাহ! হুযুর ভুল হয়ে গেছে। এই গোশত আনা আসলে আমার উচিত হয়নি। আমি ভেবেছিলাম হুযুর টের পাবেন না যে, হাঁসটা যবেহ করার পর দৌড়ে গিয়ে বাসার সামনের নর্দমায় পড়েছিল।

হুযুর বললেন:

-এখন বল তো মনসুর! আমি কিভাবে বুঝলাম হাঁসটা ড্রেনে পড়েছিলো?

আসলে আমি এর আগে একবার তার বাসায় গিয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম তার বাসার সামনে দিয়েই একটা ড্রেন চলে গেছে। আর যবেহ

করার পর, সাধারণত হাঁস দৌড়ে অনেকদূর চলে যায়। তারপর নেতিয়ে পড়ে।

(পাশাপাশি আরেকটা বিষয়ও এখানে পরিষ্কার করে দেয়া দরকার। আমরা উলামায়ে দেওবন্দ আকীদার দিক থেকে ইমাম আবুল মানসুর মাতুরীদি (রহ.) এর অনুসারী। কারামতের ব্যাপারে আমাদের আকীদা হলো আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত হক (সত্য)। শরহে আকায়েদের সেই বিখ্যাত লাইন মনে নেই?

ঃওয়া কারামাতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন? মনে পড়ে?

আহ! আমার আমার প্রিয় উস্তাদ, মাওলানা আইয়ুব সাহেব হুযুর (রহ.)। কী অসাধারণ ভাবেই না তিনি আমাদেরকে শরহে আকাঈদ পড়িয়েছেন। গল্পের চেয়েও বহুগুণ বেশি মজা করে। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩০

গায়েবি পাহারাদার

রাবিয়া ফাওযান। মিসর থেকে আসা অভিবাসী। স্বামীর সাথে লন্ডনে থাকে। দু'জনেই পড়াশোনা করে। স্বামী ফাওযান পড়াশোনার পাশাপাশি চাকুরিও করে। রাবিয়া বাসার পাশেই একটা বেবিসিটিং হাউজে একবেলা চাকুরি করে। রাবিয়া পুরোপুরি পর্দা মেনেই চলাফেরা করার চেষ্টা করে। তার জীবনে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।

-আমি গত সপ্তাহে ক্লাস শেষে আমার বান্ধবীর বাসায় গেলাম। আগামী পরশু অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার জন্য রেফারেন্স বই আনতে। বান্ধবীর বাসাটা আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে। বলতে গেলে শহরের অপর প্রান্তে।

আমাদের দু'জনের পাঠালোচনা সারতে সারতে বেশ দেরী হয়ে গেলো। এর মধ্যে বৃষ্টি নামলো। এই পরিস্থিতিতে বের না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু বান্ধবীর ঘরেও থাকার উপায় নেই। সে থাকে তার স্বামীর সাথে। কোনওরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় দু'জনের।

আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বের হয়ে পড়লাম।

বাইরে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম পরিস্থিতি ধারণার চেয়েও খারাপ। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে এখন চারদিকটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিলো না। একটা বাস পেয়েও উঠলাম না। পাতাল রেলে গেলে দ্রুত

যাওয়া যাবে এই আশায়। মনে একটা ভয়ও ছিলো, বৃষ্টি-কুয়াশার দিনে লন্ডনের পাতাল রেলগুলো বদলোকদের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব দিনগুলোতে যাত্রীও কম থাকে বিধায়, তারা আরো বেশি সুযোগ পেয়ে যায়।

সাবওয়ে স্টেশনে বসে আছি, রেলের অপেক্ষায়। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা দেখে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসলাম। বসার পর লক্ষ করে দেখলাম রুমের অপরপ্রান্তে একজন লোক বসে আছে। ভেতরটা দুরুদুরু করতে শুরু করে দিলো। লোকটা বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আর কী যেন ভাবছে? আমি ভয় পেয়ে আরো আন্তরিকতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন এলো। সাহস করে উঠে গেলাম। মনের ভয় তখনো কাটে নি। বসে বসে মনে মনে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকলাম। ট্রেনেও যাত্রী একেবারে নেই বললেই চলে। যাক ভালোয় ভালোয় ঘরে পৌঁছলাম।

পরদিন পত্রিকার পাতা উল্টিয়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ। গতকালের সেই লোকটার ছবি। লোকটা একটা মেয়ের সম্মানহানি ঘটিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ গোপন ক্যামেরার ফুটেজ দেখে, রাতের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনার সময়টা হিসেব করে দেখলাম, আমি স্টেশন ছেড়ে আসার দশ কি বিশ মিনিট পরেই এই ঘটনা ঘটে।

আমার কৌতূহল জাগলো। স্বামীকে সাথে নিয়ে সেই থানায় গেলাম। স্বামীকে বললাম:

-তুমি একটু জেনে এসো তো, লোকটা আমার ব্যাপারে কী ভেবেছিলো? লোকটা গতরাতে আমার দিকে বারবার তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলো?

স্বামী পুলিশের অনুমতি নিয়ে লোকটার সাথে কথা বলে এলো। স্ত্রীকে বললো:

-লোকটা তোমাকে ভালো করে দেখেছিলো। তোমাকে বোরখা পরিহিত দেখে সে কিছুটা দমে গিয়েছিলো। তবে সে তোমার দিকে বারবার তাকিয়েছিলো। লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বললো, সে নাকি তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে।

কেন আমাকে ভয় পাওয়ার কী আছে?

-লোকটা নাকি তোমার পেছনে দু'জন শক্তিশালী যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো। লোকটা যখনই তোমার দিকে তাকাচ্ছিলো, তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটো তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিলো। এসব দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩১

সবজান্তা যন্ত্র

আমেরিকা একটা যন্ত্র নির্মাণ করেছে। যন্ত্রটার বৈশিষ্ট্য হলো, সেটা সব জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ করতে পারে।

মহাকাশ থেকে শুরু করে, মহাসাগরের তলদেশের সংবাদও মুহূর্তেই সংগ্রহ করে বলে দিতে পারে।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের গর্বিত দাবি: তাদের এই বিরল যন্ত্রটা জানে না এমন কোন তথ্য পৃথিবীতে নেই। এই যন্ত্রটা যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। যত কঠিন প্রশ্নই হোক যন্ত্রটা উত্তর দিয়ে দেয়।

পুরো বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। কোন রাষ্ট্রের গোপন সংবাদই আর অজানা থাকবে না।

সবচে বেশি খেপলো চীন আর রাশিয়া। তারা জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রস্তাব পাশ করলো, এই যন্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে। না হলে সবাই একযোগে আমেরিকাকে বয়কট করবে।

এ চেষ্টাও বৃথা গেলো। কারণ, এটা এমন এক যন্ত্র, এটাকে কোন কিছু দিয়েই বিকল করা যাবে না। ধ্বংস করা যাবে না।

পারলে সবাই চেষ্টা করে দেখুক। রাশান বিজ্ঞানীরা ভাবলো, এ আর এমন কি। পুরো একটা পারমাণবিক বোমা দাগালেই মেশিন তো মেশিন পুরো আমেরিকাসহ উড়ে যাবে।

তারা মেশিনটা ধ্বংস করার যাবতীয় চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই সফল হলো না।

সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ বসে ঠিক করলেন, প্রত্যেক দেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি যাবে। যার যার নিজ ভাষায় দেশের সবচেয়ে কঠিন ধাঁধাটা জিজ্ঞেস করবে।

সবার আশা, হয়তো এমন কোন একটা প্রশ্ন হবে, যেটার তথ্য যন্ত্রটার কাছে নেই।

তাই করা হলো। মহাদেশ-মহাদেশ হিসেবে প্রশ্ন করা শুরু হলো। যে প্রশ্নই করা হয়, যন্ত্রটা নিমিষেই উত্তর দিয়ে ফেলে। কয়েকজন তো প্রশ্ন করার আগেই যন্ত্রটা উত্তর পেয়ে গেলো। সবার মাথায় হাত।

এশিয়া মহাদেশ শুরু হলো। একে একে প্রতিনিধিরা সামনে এসে জটিল সব প্রশ্ন করতে লাগলো। যথারীতি উত্তর পেয়ে বিরস বদনে ফিরে গেলো।

পালা এলো অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলের। ইহুদি ব্যাটা টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে নিজের পরিচয় দিলো:

আমি একজন ইসরাঈলি ভদ্রলোক, নাম মেনুচিম রেহেম।

সবাই চমকে উঠে লক্ষ্য করলো:

ভুসসসসসস আওয়াজ করে যন্ত্রটার মাথার উপরের লালবাতিটা পিটপিট করে জ্বলে উঠলো। তারপর কোওওও ক গোঁত শব্দ করে যন্ত্রটা বন্ধ হয়ে গেলো।

হৈ চৈ পড়ে গেলো। কী হলো কী হলো?

কীভাবে যন্ত্রটা বিকল হলো? কিভাবে বিকল হলো?

অনেক গবেষণা-অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার হলো:

ইসরাঈলে কোন ভদ্রলোক থাকে, এই তথ্য যন্ত্রটার কাছে ছিলো না।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩২

বিদায়ী নসীহত

স্কুলের পক্ষ থেকে আজ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাসফরে যাবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ভোর আটটায় বাস ছাড়বে। ইতিমধ্যেই প্রায় সব ছাত্রছাত্রী এসে পড়েছে।

প্রধান শিক্ষক জনাব বজলুল হুদা কখনো এ ধরনের সফরে যান না। সহকারী শিক্ষকদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দেন। এবারও তাই। কিন্তু তিনি প্রতিবারই একটা কাজ করেন। তিনি জেলা সড়কের মাথা পর্যন্ত বাসে করে যান। তারপর নেমে চলে আসেন।

বাস থেকে নামার আগে স্যার একটা কাজ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত একটা বক্তব্য দেন। এবারও ব্যতিক্রম হলো না। বাসে বসা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে অনেক কথাই তিনি বললেন। কথাটা শেষ করলেন এই বলে:

-শাদা হলেই যে সুন্দর এমনটা নয়। আর কালো হলেই কুৎসিত এই ধারণাও ঠিক নয়।

=কাফনের রঙ শাদা, কিন্তু ভীতিকর। আমাদের মুসলমান কা'বাঘরের রঙ কালো অথচ সুন্দর।

বাবারা! মানুষের সৌন্দর্য তার বেশভূষা বা বাহ্যিক আবরণে নয়, তার আখলাক-চরিত্রে।

=উচ্চ স্বরে কথা বলতে পারাই যদি পৌরুষের পরিচায়ক হতো, তাহলে কুকুরই হতো সেরা পুরুষ। উদাম হয়ে থাকাটাই নারীত্ব হতো তাহলে বানরই হতো সেরা নারী।

=তোমার দু'চোখ তুলে আল্লাহর কাছে হারানো বস্তু চাওয়ার আগে চোখ দু'টোকে নামিয়ে রাখ। তোমার হাতে থাকা নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করো।

-তোমরা সফরে যাচ্ছ, সফরটা যাতে শিক্ষণীয় হয়। তোমাদের জন্য, অন্যদের জন্যও, এদিকটা সবাই লক্ষ্য রাখবে।

-জ্বি স্যার।

-ফী আমা-নিল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩৩

সপ্তাশ্চর্য

সাপ্তাহিক পরীক্ষা চলছে। বিষয় সাধারণ জ্ঞান। প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দেয়া হয়েছে। তিনটা প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। ঘোষণা দেয়া আছে, একটা প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়ে গেলেই জমা দিয়ে যেতে। ছাত্রদের সুবিধার্থে আলাদা আলাদা কাগজও বিতরণ করা হয়েছে।

তিনটা প্রশ্নের একটা ছিলো:

বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যগুলো লিখ।

ছাত্ররা মোটামুটি সবাই লিখেছে:

১: মিসরের গিযায় অবস্থিত পিরামিড।

২: আগ্রার তাজমহল।

৩: আমেরিকার কলোরাডোয় অবস্থিত বিস্তীর্ণ প্রেইরি ভূমি।

৪: পানামা খাল।

৫: এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

৬: পিসার হেলানো মন্দির।

৭: চীনের মহাপ্রাচীর।

গড়পড়তা সবাই এমনই লিখেছে। ব্যতিক্রমও আছে, কেউ কেউ মস্কোর ঘণ্টার কথা লিখেছে। কেউ সুন্দরবনের কথাও লিখেছে।

কিন্তু একটা ছেলে লিখেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন সাতটা বস্তুর নাম। সে লিখেছে:

-বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের ব্যাপারটা আপেক্ষিক।

শিক্ষক জানতে চাইলেন:

-তোমার দৃষ্টিকোণ থেকেই বলো শুনি।

-স্যার, তাহলে তো সংখ্যাটা সাত না হয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে।

-তুমি প্রথম সাতটাই আগে বলো।

-আচ্ছা স্যার!

১: আমাদের দুই চোখ। আমরা দেখতে পারি এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

২: আমাদের দুই কান। আমরা শুনতে পাই। এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

৩: দুই হাত ও ত্বক। আমরা ইচ্ছা করলেই কোনও কিছু ছুঁতে পারি, ধরতে পারি। এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

৪: জিহ্বা। আমরা চাইলেই কোনও কিছুর স্বাদ নিতে পারি। এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

৫: আমাদের অনুভূতি। আমরা অনেক বিষয়কে অনুভব করতে পারি। এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

৬: আমাদের হাসি। এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

৭: আমাদের ভালোবাসা। এটা আল্লাহর অনেক বড় এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

আল্লাহর দান করা প্রতিটি বস্তুই আসলে আশ্চর্যজনক বস্তু। একজন মানুষই বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তু।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩৪

সবুজ-ফিতা কর্মসূচী

তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার 'ইমাম হাতেফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। দশম শ্রেণীর একটি শ্রেণীকক্ষে ক্লাস চলছে। এখন পাঠদান করছেন শিক্ষিকা আইলিন হারিকা।

আইলিনের বিষয় মূলত কনসালটেশন। শীক্ষার্থীরকে পরামর্শ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রেরণাদান। এ ক্লাসে ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। মাঝেমধ্যে অভিভাবকদেরকেও এই ক্লাসে হাজির হতে বলা হয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকত্রয়ের সমন্বয়ে একটি নিখুঁত আত্মন্নোয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই স্কুলের এ নিয়ম চলে আসছে। সপ্তাহে একদিন করে স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে আলাদা আলাদা করে কনসালটেশন ক্লাস হয়।

আইলিন আজ আলোচনা করছেন অন্যকে স্বীকৃতি দেয়ার উপকারিতা নিয়ে।

-আমাদের আজকের কর্মসূচীর নাম হলো 'সবুজ ফিতা' আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যাচাই করে দেখবো, আমরা আমাদের আশপাশে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারি। তোমরা কি বলতে পারবে, এই পরিবর্তনের আন্দোলনটা আমরা কিভাবে করবো?

-জ্বি, ম্যাডাম। আমরা অন্যের যোগ্যতার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে এই কর্মসূচীর সূচনা করবো। কিন্তু ম্যাডাম, এই স্বীকৃতিপ্রদানের পদ্ধতিটা কী হবে?

-সেটাই আমি এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি। কর্মসূচীটা আমি তোমাদেরকে দিয়েই শুরু করবো বলে ভেবেছি। এই দেখো আমার হাতে এগুলো কী?

-একগুচ্ছ সবুজ ফিতা।

-ঠিক ধরেছ। ফিতাও বলতে পারো আবার ব্যাজও বলতে পারো। আমি এখন তোমাদের মধ্যে যারা সার্বিকভাবে ভালো করেছ, তাদের গুণগুলো তুলে ধরে একটা করে ব্যাজ তার বুকপকেটে এঁটে দিবো। প্রথমেই বলি মেসুতের কথা।

মেসুত: তুমি আমার দৃষ্টিতে এই ক্লাশের সবচেয়ে ভালো ছেলে। আমি

খেয়াল করে দেখেছি, তুমি প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর সাথে সাথেই বাসায় চলে যাও না। তোমার গাড়ি দরজায় অপেক্ষায় থাকে, তবুও তুমি প্রতিদিন বাগানের মালির সাথে কিছুক্ষণ কাজ করে যাও। তোমার এই গুণ আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে। আমার কাছে এসো, তোমাকে একটা ব্যাজ পরিয়ে দিই। আর এই নাও আরো তিনটা অতিরিক্ত ব্যাজ। এগুলো হাতে রাখ।

-এগুলো দিয়ে কী করবো ম্যাডাম?

-অপেক্ষা করো পরে বুঝিয়ে বলছি।

এবার হাকান সামনে আসো। তোমাকে দেখি প্রতিদিন ক্লাসে আগে আগে এসে দরজা-জানালাগুলো সুন্দর করে খুলে দিতে। কাছে এসো, তোমাকে একটা ব্যাজ পরিয়ে দেই। আর এই নাও তিনটা অতিরিক্ত ব্যাজ।

আইলিন হারিকা এভাবে একে একে অনেককেই তাদের বিশেষ গুণের স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। সবাই অতিরিক্ত তিনটা করে ব্যাজও দিয়ে দিলেন।

-এবার আমাদের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্বে এসো। তোমাদের প্রত্যেককে তো তিনটা করে ব্যাজ দিয়েছি।

-জ্বি ম্যাডাম!

-আমরা প্রত্যেকেই আমাদের আশেপাশের একজনকে তার বিশেষ কোনও গুণের স্বীকৃতি দিয়ে একটা ব্যাজ পরিয়ে দেবো, বাকী দু'টো ব্যাজ তার হাতে দিয়ে বলবো:

-আপনার একজন পছন্দের মানুষকে তার গুণের স্বীকৃতি দিয়ে একটা ব্যাজ পরিয়ে দেবেন। তারপর অতিরিক্ত একটা ব্যাজ তার হাতে দিয়ে বলবো, আপনার অতিপ্রিয় একজন মানুষকে তার বিশেষ গুণের স্বীকৃতি দিয়ে, ব্যাজটা তার বুকে এঁটে দিবেন।

এখন বলো, তোমাদের পক্ষে কি এটুকু করা সম্ভব?

-জ্বি ম্যাডাম।

-তাহলে এই কথাই রইলো। আগামী সপ্তাহে আমি সবার কাছ থেকে এই আন্দোলনের ফলাফল শুনবো। যার কারগুযারি সবচেয়ে সুন্দর হবে তার জন্য থাকবে বিশেষ স্বীকৃতিমূলক ব্যাজ ও পুরস্কার।

পরের সপ্তাহে ক্লাস শুরু হওয়ার পর একে একে সবার কারগুযারি শোনা হলো। ক্লাসের সবার মতামতের ভিত্তিতে সবচেয়ে সেরা কারগুযারির জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়েছে 'হাকান সুকের'। হাকান বললো:

-আমি গত সপ্তাহের ক্লাস শেষেই বাড়ির পাশের একটা ফ্যাক্টরিতে গিয়েছি। সেখানে আমার একজন আত্মীয় থাকেন। তিনি খুবই পরিশ্রমী আর সৎ ব্যক্তি। তার কাছে গিয়ে আমাদের কর্মসূচীর কথা বললাম। তার অনেকগুলো গুণের কথা বলে তাকে একটা ব্যাজ পরিয়ে দিলাম। তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফিরে আসার সময় তার হাতে দুইটা ব্যাজ দিয়ে কিভাবে কী করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলাম।

আমি গতকাল আমার সেই ভাইয়ের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম তিনি কর্মসূচীটা কেমন পালন করলেন। তিনি বললেন:

-তুমি আমাকে ব্যাজ দুটো দেয়ার পর থেকেই ভাবছিলাম, আমি কাকে পরাবো? অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, আমাদের কোম্পানীর মালিককেই এই ব্যাজটা পরিয়ে দেবো।

সময় নিয়ে তার চেম্বারে গেলাম। তিনি আমার কুশল জানতে চাইলেন। টুকটাক আরো কথাবার্তা হলো। আমি কিভাবে ব্যাজের বিষয়টা উত্থাপন করবো ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী আর গোমড়ামুখো। সবাই তাকে ভয় পায়। কেউ তাকে কখনো হাসতে দেখে নি। তারপরও শেষমেষ সাহস করে বলেই ফেললাম।

= স্যার! আপনি কি জানেন আপনার মধ্যে অসাধারণ একটা গুণ আছে?

-কী সেটা?

-আপনার মধ্যে স্যার বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তি আছে। আপনার এই উদ্ভাবনী শক্তির কারণেই আমরা আজ দেশের সেরা রপ্তানিকারক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছি। এ কারণে আমার মতো শত শত কর্মচারির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

যদি কিছু মনে না করেন, আমি স্যারের এই যোগ্যতার স্বীকৃতস্বরূপ বুকপকেটে একটা ব্যাজ লাগিয়ে দিতে চাই।

আমার কথা শুনে স্যারের মুখটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। তিনি বললেন:

-ব্যাপারটাতে একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে, তারপরও ঠিক আছে। দাও। পরিয়ে দাও।

আমি ব্যাজটা স্যারের বুকে লাগিয়ে দিলাম। আসার সময় আরেকটা ব্যাজ তার হাতে দিয়ে, পদ্ধতিটা তাকে বলে এলাম।

পরদিন স্যারের কাছে অবশিষ্ট ব্যাজের খবর নিতে গেলাম। স্যার অবাক করা কথা শোনালেন। তিনি বললেন:

-তুমি আমাকে ব্যাজটা দিয়ে যাওয়ার পর, ভাবতে বসলাম, আমার

সবচেয়ে প্রিয় মানুষটা কে? সাথে সাথেই উত্তর এল, আমার চৌদ্দবছর বয়েসী মেয়েটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

রাতে বাড়ি ফিরেই সাথে সাথে মেয়ের রুমে গেলাম। আমি রাশভারী মানুষ হওয়াতে মেয়ের সাথে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিক ছিলো না। ওর সাথে আমার তেমন একটা কথাও হতো না। আমি মেয়ের রুমে গিয়ে বিছানার একপাশে বসলাম। তাকে ব্যাজের ব্যাপারটা খুলে বললাম। সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলো। মেয়েটা আমাকে খুবই ভয় করতো। এই বয়েসেও তাকে আমি কঠিন শাসনে রাখতাম। মেয়েকে বললাম:

-মাগো! আমি তোকে সব সময় শাসন করেছি। মারধর করেছি। সুন্দর করে তোর সাথে কখনো কথাও বলি নি। আমি জানি তুই আমাকে পছন্দ করিস না। কিন্তু আমার কাছে তোর চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। আমি স্বীকার করছি, তোর প্রতি আমি বেশি মনোযোগ দিতে পারি নি। পিতার ভালোবাসা দিতে পারি নি। দিয়েছি শুধু শাসন। ধমক ছাড়া তোর সাথে কথা বলিনি। কাছে আয়, তোকে ব্যাজটা পরিয়ে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হিসেবে তোকে স্বীকৃতি দেই।

আমার কথা শুনে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেদে উঠলো। কান্না যেন থামতেই চাইছিলো না। অবাক হয়ে তার কান্নার কারণ জানতে চাইলাম। অনেকক্ষণ পর কান্না থামিয়ে যা বললো, শুনে আমার মাথা ঘুরে উঠলো। সে বললো:

-আব্বু! ইদানীং আমার কাছে কিছুই ভালো লাগছিলো না। স্কুলে গেলে বান্ধবীরা তাদের বাবাদের কত কথা বলে, বাড়িতে তারা কত আনন্দে থাকে এটা বলে, কিন্তু আমি তাদের কাছে বাবার কথাও বলতে পারি না, বাড়ির কোনও আনন্দের কথাও বলতে পারি না। বান্ধবীরা এজন্য আমাকে করুণার দৃষ্টিতে দেখতো। আমার মধ্যে তীব্র হতাশা জন্ম নিল। ঠিক করেছিলাম আত্মহত্যা করবো। এমন কষ্টকর জীবন রেখে লাভ কী? আজ রাতই ছিলো আমার শেষ রাত। এজন্য আমি তোমার আর আম্মুর নামে একটা চিঠিও লিখে রেখেছিলাম।

-কই দেখি চিঠিটা?

মেয়ে চিঠি বের করে দিলো। খামের ওপরে লেখা:

আব্বু ও আম্মুকে-

আব্বু-আম্মু!

আমি চলে গেলাম। তোমাদেরকে আর কষ্ট দিতে চাই না। পারলে আমাকে ক্ষমা করো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩৫

সংসদ অধিবেশন

সংসদ অধিবেশন চলছে। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে এক এমপি কথা বলছে। প্রধানমন্ত্রী কেমন তার বিবরণ দিচ্ছেঃ

-আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিন্দা ওলী। যুগের খিযির। তার মতো মানুষ আর হয় না। তার মতো মানুষ আছে বলেই পৃথিবী টিকে আছে। আমরা খেয়ে-পরে বেঁচে-বর্তে আছি।

তিনি কেমন মানুষ একটা গল্প বললেই আপনাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যাবেঃ

-এক লোকের তিন ছেলে। লোকটার ইচ্ছা হলো নিজের সন্তানদের বুদ্ধি যাচাই করবেন। প্রথম ছেলেকে ডাকলেন:

-বাবা এই নাও একশ টাকা। বাজারে গিয়ে এমন কিছু কিনে আনো, যা দিয়ে ঘরটা ভর্তি হয়ে যায়।

ছেলেটা গিয়ে তুলা কিনে আনলো। পুরো ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার পরও আরো খালি জায়গা থেকে গেলো।

এরপর দ্বিতীয় ছেলেকে একশ টাকা দিলেন।

ছেলে বাজার ঘুরে একশ টাকার রান্তা (কাঠের দোকানের খোসা) কিনে আনলো।

পুরো ঘরে ছিটিয়ে দেয়ার পর দেখা গেলো আরো জায়গা বাকি রয়ে গেছে।

এবার তৃতীয় ছেলেকে টাকা দিয়ে পাঠালেন। ছেলে বাজারে গিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা মোমবাতি কিনে আনলো। ঘরের ঠিক মাঝ বরাবর জ্বালিয়ে দিলো।

পুরো ঘর আলোয় ভরে উঠলো। পিতা খুশি হয়ে বললো এই ছেলেটাই কাজের হয়েছে। বুদ্ধিমান হয়েছে।

এমপি তার বক্তব্যের উপসংহার টানলেন:

-আমাদের প্রধানমন্ত্রী হলেন এই তৃতীয় ছেলেটার মতো। তিনি ডিজিটাল দেশের প্রতিটি আনাচ-কানাচকে আলোকিত করে দিয়েছেন। উজ্জ্বল করে দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার! আমার বক্তব্য এখানেই শেষ।

সাথে সাথে একজন (গৃহপালিত বিরোধীদলীয়) এমপি তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলো:

-মাননীয় স্পীকার! আমি জানতে চাই বাকি পঁচানব্বই টাকার কী হলো? এর হিসাব জানতে চাই।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩৬

মাতৃসম শিক্ষিকা

মার্সেই। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অভিবাসীবহুল শহর। অভিবাসীদের মধ্যে আলজেরীয়দের সংখ্যাই বেশি। এই শহরের একটা এলাকার নাম ক্যাসেলাইন। এখানে ইউনিসেফ পরিচালিত একটি স্কুল আছে। মূলত অভিবাসী মরক্কান ও আলজেরীয় শিশুরাই এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। এই স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার জাতিসংঘই বহন করে। শিক্ষকও তারা নিয়োগ দেয়। স্কুলে এবার একজন নতুন শিক্ষিকা এসেছেন। নাম মিস ক্লারা। উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর একজন মানুষ।

মিস ক্লারার অভ্যেস হলো প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতেই সব ছাত্রদেরকে কথা প্রসঙ্গে একবার বলেন:

-আমি তোমাদের সবাইকে, সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তোমরাই আমার প্রিয়জন।

ছাত্ররা এতে বেশ উদ্দীপিত হয়। পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়। মিস ক্লারা দেখেছেন, একথা বলার কারণে ছাত্ররা তাকে আপন মনে করে। কাছের মানুষ বলে মনে করে।

পঞ্চম শ্রেণীতে একজন ছাত্রকে দেখে মিস ক্লারা বেশ অবাক হন। ছেলেটা সব সময় সামনের বেঞ্চিতেই বসে। চুপচাপ ধরনের। উদাস হয়ে সারাক্ষণ কী যেন ভাবে। ক্লাসের সবাই হাসলেও ছেলেটা হাসে না। ছুটির সময় বাইরে খেলতে যায় না। নিজ আসনেই ঠায় বসে থাকে। উৎসাহমূলক কথা বললেও তার অভিব্যক্তিতে কোনও হেরফের ঘটে না। ছেলেটার নাম আব্দুল আযীয। তার পোশাক-পরিচ্ছদও আগোছালো। দীনহীন। ময়লাটে। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় তার ফলাফল ছিলো খুবই খারাপ।

স্কুলের একটা নিয়ম হলো প্রত্যেক শিক্ষককে নিজ নিজ ক্লাশের প্রত্যেক ছাত্রের অতীতের রেকর্ডগুলো জানতে হয়। স্কুলে প্রতিটি ছাত্রের আগের

পরীক্ষা ও আচরণের একটা বিবরণ সংরক্ষিত আছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় পারিবারিক তথ্যও লিখে রাখা হয়। ছাত্রদের এই তথ্য সংগ্রহের বিষয়টা এখানে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।

মিস ক্লারা ঠিক করলেন, আজ ছুটির পর স্কুল আর্কাইভসে গিয়ে, আব্দুল আযীযের পুরনো রিপোর্টগুলো পড়ে দেখবেন। সে কি শুরু থেকেই এমন নাকি বিশেষ কোনও কারণে বর্তমানে সে এমন। মিস ক্লারা একে একে গত চার বছরের রিপোর্ট দেখলেন।

প্রথম শ্রেণী:

আব্দুল আযীয খুবই মেধাবী ছেলে। সে ক্লাসের সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবার চেয়ে বেশি মেধাবী। সবাই তাকে পছন্দ করে। তার হাতের লেখা খুবই চমৎকার। তাকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বলে মনেই হয় না। তার আচার-আচরণও ভদ্র। হাশিখুশি ধরনের ছেলে। সারাক্ষণ ঠোঁটে তার হাসি লেগেই আছে। সামান্য ছুঁতো পেলেই সে হাসে।

-আসমা বুতেক্লিপা

দ্বিতীয় শ্রেণী:

আব্দুল আযীয গত বছরের তুলনায় এ বছর আরো ভালো করেছে। ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষায় সে তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। স্কুলের সবার কাছেই সে প্রিয়। ছোট হয়েও সে তার ক্লাসে সবার মধ্যমণি। সবার প্রিয়পাত্র। বছরের শেষের দিকে সে একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পড়ালেখাতেই কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছে। তার মা কিছুদিন হলো খুবই অসুস্থ। মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকার কারণে স্কুলেও সে অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

-ফাতিমা জুরহাম

তৃতীয় শ্রেণী:

মায়ের মৃত্যুর শোকটা আব্দুল আযীয কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সে তবুও মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় কোনও কমতি করছে না। কিন্তু আগের মতো ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তার পিতাও ছেলের প্রতি অতটা মনোযোগ দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে তার জীবনটা শিঘ্রই ভিন্ন রকম হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

-অঁরি গিয়োম

চতুর্থ শ্রেণী:

আব্দুল আযীয স্কুলের পড়ায় মোটেও মন দিচ্ছে না। সে গত বার্ষিক পরীক্ষায় খুব খারাপ ফলাফল করেছে। যেভাবে চলছে, কিছুদিন পর আর পড়ালেখা বুঝতে পারবে না। প্রায়ই ক্লাসে বসে বসে ঝিমোয়।

-থমাস মুলার

মিস ক্লারা এবার সমস্যা কোথায় সেটা বুঝতে পারলেন। মনে মনে লজ্জিত হলেন, না জেনেই তিনি ছেলেটার প্রতি ভুল ধারণা করেছিলেন।

এই স্কুলে প্রতিবছর একটা অনুষ্ঠান হয়, 'আত্মার বিনিময়'। ছাত্রশিক্ষক সবাই একে অপরকে কিছু না কিছু উপহার দেয়। ছাত্রদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো পুরস্কারটা দশ ফ্রাঙ্কের বেশি হতে পারবে না। এতে করে অল্পটাকায় ভালো জিনিস কেনার একটা পরীক্ষা হয়ে যায়, আবার নিজের মধ্যে উপহার দেয়ার মানসিকতাও গড়ে ওঠে। আবার কেউ চাইলে ঘরে-তৈরী কিছু দিয়েও উপহারপর্ব সারতে পারে।

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা উপহারচর্চা করবে তাদের শ্রেণীশিক্ষক মিস ক্লারার সাথে। ক্লাসের সবাই যে যার উপহার এনে সামনের টেবিলে রাখলো। সুন্দর সুন্দর মোড়কে আবৃত। রঙ-বেরঙের ফিতা দিয়ে বাঁধা। হরেক রকমের উপহারের ভীড়ে একটা উপহারকে বেশ বেমানান লাগছিলো। রঙ ওঠা একখণ্ড ধূসর কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। ওপরে নাম লেখা আছে: আব্দুল আযীয। ছাত্ররা এমন বেখাপ্পা প্যাকেট দেখে হেসে দিল। মিস ক্লারা সবার হাসি থামিয়ে প্যাকেটটা খুললেন। তাতে আছে একটা নকল হীরের পুঁতি বসানো পুরোনো একটা ব্রেসলেট। কয়েকটা পুঁতির জায়গা আবার খালি। আর অর্ধেক হয়ে যাওয়া সেন্টের একটা শিশি।

মিস ক্লারা বললেন:

-আব্দুল আযীয! তোমার উপহার আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।

তিনি ব্রেসলেটটা হাতে পরলেন। সেন্টের শিশি থেকে কিছুটা গায়েও মাখলেন।

স্কুল ছুটির পর সবাই চলে গেলো। মিস ক্লারাও বাড়ির পথে রওনা দিলেন। স্কুলের সদর দরজার কাছে দেখলেন, আব্দুল আযীয দাঁড়িয়ে আছে।

-কী, কিছু বলবে?

-ম্যাম! আপনি যখন ব্রেসলেটটা হাতে পরে হাসছিলেন, তখন আপনাকে ঠিক আমার আম্মুর মতো লাগছিলো।

একথা বলেই আব্দুল আযীয দৌড়ে পালিয়ে গেলো। মিস ক্লারা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখের কোণটা একটু ভিজে উঠেছিল। আঙুল দিয়ে মুছে বাসার পথে হাঁটা দিলেন। বাসায় যেতে যেতে ঠিক করলেন, শিক্ষকতার পেশাকেই স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবেন। আব্দুল আযীযের মতো মা-হারা ছেলেগুলোকে আদরে যত্নে গড়ে তুলবেন।

পরদিন থেকেই মিস ক্লারা আব্দুল আযীযের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিতে শুরু করলেন। তার সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। আস্তে আস্তে দু'জনের সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষিকা থেকে মাতা-পুত্রের সম্পর্কে রূপ নিচ্ছিল। মিস ক্লারা ছাত্রকে উৎসাহ-প্রেরণা যুগিয়ে যেতে লাগলেন। বছর শেষে দেখা গেল আব্দুল আযীয ক্লাসের সেরা দশজনের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। পুরো স্কুল স্তম্ভিত এই অলৌকিক-অসম্ভব ফলাফল দেখে।

প্রথম চিঠি:

ফলাফলের পরদিন মিস ক্লারা সকালে দরজা খুলেই সামনে একটা খাম দেখতে পেলেন। খামটা খুলে ভেতরের ছোট্ট চিরকুটটা পড়লেন। তাতে লেখা আছে:

-আপনি ছাড়া আমার এই ফলাফল করা সম্ভব হতো না। আপনিই আমার জীবনের সেরা শিক্ষক। আপনাকে আমার মা............।

দ্বিতীয় চিঠি:

চাকরির খোঁজে আবদুল আযীযের পিতা অন্য শহরে চলে গেল। সাথে আবদুল আযীযও গেলো। সে হাইস্কুলে ভর্তি হলো। এর ছয় বছর পর, মিস ক্লারা একদিন আরেকটা চিঠি পেলেন:

-আমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেছি। আপনিই আমার জীবনের প্রেরণা। আপনার বাড়িয়ে দেয়া সিঁড়ি বেয়েই আমার এতদূর আসা। আপনার চেয়ে ভালো কোনও শিক্ষক আজো আমার চোখে পড়েনি। আপনি আমার মা............।

তৃতীয় চিঠি:

চার বছর পর মিস ক্লারা আরেকটা চিঠি পেলেন।

-আমি রেকর্ড পরিমাণ নাম্বার পেয়ে কলেজের পাঠ শেষ করেছি। আমার অর্জিত প্রতিটি অক্ষরের মধ্যেই আপনার মমতা মাখা ছোঁয়া অনুভব করি।

আপনি আমার জীবনের সেরা শিক্ষকই নন, আমার জন্মদাত্রী মায়ের মতোও বটেন.........

চতুর্থ চিঠি:

আরো চার বছর পর, মিস ক্লারা আরেকটা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা:

-আমার প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার পাট শেষ হয়েছে। এবার আমার নিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাকে লেকচারার হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে। আমি এতবড় সম্মানের যোগ্য নই। কিন্তু আমার জীবনে আপনার দানকে যথাযথ সম্মান দেখাতেই অধ্যাপনা পেশাকে গ্রহণ করলাম। আপনি আমার মা...........। -ইতি ড. আব্দুল আযীয।

পঞ্চম চিঠি:

কয়েক মাস পরেই মিস ক্লারা আরেকটা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা আছে:

-মাদার! আপনি জানেন, কিছুদিন আগে আমার আব্বু মারা গেছেন। আপনার জেনে ভালো লাগবে, একজনকে আমার পছন্দ হয়েছে। সেও আলজেরিয়ান। নাম হাসিবা বুলমার্কা।

আপনি ছাড়া আমার আপন বলতে কেউ বেঁচে নেই। আপনি যদি কষ্ট করে বিয়ের দিন আমার মা হিসেবে কনেকে ঘরে উঠিয়ে দিতেন!।

বিয়ের দিন মিস ক্লারা পুরোনো একটা ব্রেসলেট আর অনেক পুরোনো ব্র্যান্ডের একটা সেন্ট মেখে হাযির হলেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। চোখেও ভালো দেখতে পান না। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলো। বিদায়ের সময় আবদুল আযীয বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো:

-মাদার! আপনার প্রেরণা ছাড়া নিজের শক্তিকে আমি বুঝতে পারতাম না। নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেতাম না। মা-হারা একটা এতিম শিশুকে আপনি মায়ের আদর দিয়ে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এ ঋণ শোধ করার নয়।

-মাই ডিয়ার বয়! তুমি পুরোপুরি ঠিক কথা বলছ না। আমিই বরং তোমার কাছে শিখেছি, কিভাবে একজন শিক্ষিকা হতে হয়। তোমার কাছেই আমি জেনেছি যে আমিও চাইলে পরিবর্তন আনতে পারি। তোমাকে ছাড়া আমার এই অপূর্ব অভিজ্ঞতাও হতো না। গুড বাই। মাই সন। সুখে থেকো। গড ব্লেস ইউ বোথ।

মায়ের হাহাকার

হেঁটে হেঁটে মতিঝিল আসছি। কিছুটা সামনে দেখলাম একটা জটলা হেঁটে যাচ্ছে। বেশিরভাগই ছোট ছেলে। বেশ কৌতূহল জাগলো। পা চালিয়ে হেঁটে এগুলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম:

-একটা কাগজকুড়ুনি ছেলের হাতে দুইটা কুকুরছানা। ছেলেটা ছানা দু'টো বুকে জড়িয়ে ধরে জোরকদমে হাঁটছে। তার পেছন পেছন একটা কুকুর ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাচ্ছে।

বুঝতে পারলাম ওটা মা-কুকুর। অবাক কাণ্ড! কুকুরটার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরপর মা কুকুরটা লাফ দিয়ে ছানা দু'টোকে জিহ্বা দিয়ে ছুঁতে চাইছে। কিন্তু ছেলেটা তা হতে দিচ্ছে না। মা কুকুরটা কুঁউ কুঁউ করে কাঁদছে আর পিছু পিছু ছুটছে। আবার লাফ দিয়ে কলিজার টুকরো দু'ছানাকে জিহ্বা দিয়ে ছুঁতে চাইছে।

আশেপাশের লোকজন দৃশ্যটা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লো। সবার মধ্যেই মা-কুকুরটার সন্তান হারানোর তীব্র যাতনাটা ছড়িয়ে পড়লো। কয়েকজন লোক এগিয়ে গিয়ে নির্দয় ছেলেটাকে বললো:

-এই ছানাগুলো ছেড়ে দাও।

ছেলেটা ছাড়লো না। মা-কুকুরটা একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার কুঁউ কুঁই করে ছেলেটার পিছু পিছু ছুটছে। লাফিয়ে কলিজার নাড়িছেঁড়া ধনকে জিহ্বা দিয়ে ছুঁতে চাইছে। কিন্তু ছেলেটা ছানা দু'টোকে আরো উঁচিয়ে ধরছে। মা-কুকুরটা পাগলের মতো হয়ে গেলো। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। পরক্ষণেই ছুটে যাচ্ছিলো ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া ছানাদুটোর দিকে।

আমার আর দৃশ্যটা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। আমি এগিয়ে যেতে উদ্যত হলাম। তার আগেই এক ভাই দুরন্ত গতিতে ছুটে গিয়ে ছেলেটা থেকে ছানা দু'টো কেড়ে নিয়ে বললো:

-এই ব্যাটা! শয়তানির আর জায়গা পাস না, না? কুকুর ছানাগুলোর দিকে আর এক পা এগুবি তো ঠ্যাং ভেঙে ফেলবো।

লোকটা কুকুর ছানা দু'টো রাস্তার ওপর নামিয়ে রাখল। মা কুকুরটা ভীষণ বেগে ছুটে এসে বাচ্চা দু'টোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জিহ্বা দিয়ে ভীষণভাবে আদর করতে লাগলো।

একটু পরে মা-কুকুরটা মুখ তুলে সামনের দিকে তাকালো। এরপর উঠে গিয়ে যে লোকটা ছানাগুলো ছেড়ে দিয়েছে, তার চারপাশে একটা চক্কর দিলো। তারপরে পায়ের কাছে বসে জিহ্বা দিয়ে পা চাটতে শুরু করলো।

দৃশ্যটা দেখে উপস্থিত দর্শক অনেককেই দেখলাম চোখের পানি মুছছে। একটা মায়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সবাইকে অভিভূত করে ফেললো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩৮

উত্তম প্রতিপালন

এক:

সংসারের যাবতীয় খরচ স্ত্রীর হাতেই দিয়ে দেন করীম সাহেব। প্রয়োজনে তার কাছ থেকে নিয়ে খরচ করেন। জুলায়খা বেগমও টাকাটা খুবই হিসাব করে খরচ করেন। একটা পয়সাও এদিক-ওদিক হতে দেন না। তাই বলে কিপ্টেমীও করেন না। একটা সংসারের খায়-খরচাও কি কম? তবুও এই অল্প টাকাতেই কিভাবে যেন সংসারের চাকাটা মাস ঘুরে আসে। পড়শী মহিলারা অবাক হয়, এত কম টাকায় এত সুন্দরভবে সংসার চলে কিভাবে?

জুলায়খা বেগম মনে করেন তাদের সংসারে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বরকত দান করেন। জুলায়খা বেগম একটা আমল খুবই গুরুত্বের সাথে করার চেষ্টা করেন। তিনি বাড়িতে সাহায্য চাইতে আসা একজন ফকীরকেও খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। এই দান-খয়রাতের অভ্যেসটা যাতে বাচ্চাদের মধ্যেও তৈরী হয় সেজন্য তিনি

একটা কৌশল অবলম্বন করেন। প্রতিদিন বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় তাদের দুপুরে টিফিনের জন্য যা খরচ হবে, জুলায়খা বেগম তার চেয়ে কয়েক টাকা বাড়িয়ে দেন। তিনি ঘরে একটা মাটির ব্যাংক রেখেছেন। বাচ্চারা যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন তাদেরকে বলেন:

-তোমার যত টাকা লাগবে সেটা রেখে বাকী টাকা মাটির ব্যাংকে রেখে যাও।

বাচ্চারা অনেক সময় নিজের খরচের টাকা থেকেও কয়েক টাকা বাড়িয়ে রেখে দেয়। একদিন না হয় দুপুরে কম নাস্তা করলো।

ছোট মেয়ে সারা সেদিন জিজ্ঞাসা করলো:

-আম্মু এ টাকা দিয়ে কী করবেন?

-এগুলো দিয়ে আমাদের ঘরে বেড়াতে আসা মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করাবো। তাদেরকে সাহায্য লাগলে এখান থেকে কিছু দেবো। পাড়ার গরীবদেরকে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করবো।

দুই:

সাদিক সাহেব প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সময় ছেলে খালিদকে সাথে করে নিয়ে যান। তাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে অফিসের পথ ধরেন।

সাদিক সাহেব প্রতিদিন ছেলের হাতে দুপুরে টিফিনের টাকাটা দিয়ে যান। সাথে কয়েকটা টাকা বাড়িয়ে দেন।

-আব্বু! অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কী করবো?

-তুমি টিফিন-ছুটিতে লক্ষ রাখবে, তোমার ক্লাসে কোনও ছেলে নাস্তা না করে বসে আছে কিনা। এমন কেউ থাকলে তাকেও তোমার সাথে ক্যান্টিনে নিয়ে যাবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৩৯

শান্তির ফর্মুলা

ডক্টর আহমাদ সুলতান (?-১৯৯৯)। বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। থাকেন বাঙ্গালোরে। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সুলতান টিপুর (রহ.) বংশধর। তিনি এতবড় মুজাহিদের বংশধর হলেও তিনি জীবন যাপন করে গেছেন ভিন্নভাবে। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

এই শান্তির জন্য তিনি কিছু ফর্মূলা মেনে চলতেন।

এক: মোটর দুর্ঘটনা

একবার আমার ছেলেটা রাতের বেলায় গাড়ি নিয়ে বের হলো। রাত এগারটার দিকে সে বাসায় ফিরে এল। ঝড়ের গতিতে নিজের কামরায় গিয়ে দরজা এঁটে দিল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। এমন তো কখনো হয় না? সে তো বাড়ি ফিরে প্রথমেই মায়ের কাছে আসে, আমার সাথে কথা বলে। আজ ব্যতিক্রম কেন হলো? এসব ভাবছিলাম বসে বসে।

আচানক বাসার কলিং বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখি দুই হিন্দু যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারায় রাগ ধিকধিক করছে। তাদের একজন বেশ বেয়াড়া ভঙ্গিতে বললো:

-আপনার ছেলে আমার মোটর সাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। এরপর সে গাড়ি না থামিয়ে সোজা চলে এসেছে।

আমি তাদের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে খুবই মোলায়েম স্বরে বললাম:

-ইশ! তাই নাকি। তা বাবারা! একটু ভেতরে আসতে পারবে? বসে বসেই তোমাদের সাথে কথা বলি?

আমার বিনীত অনুরোধ তারা দু'জন ফেলতে পারল না। ভেতরে এসে বসলো। তখন আমি বললাম:

-বাইরে তো খুব ঠাণ্ডা পড়ছে, আসুন আমরা চা পান করতে করতে কথা বলি?

এভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর, তাদের রাগ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়ে গেলো। তারা সানন্দচিত্তে বিদায় নিল।

দুই: মনোমালিন্য

আমাদের পাড়ার একজন হিন্দু যুবক এল। তাকে বড়ই পেরেশান মনে হচ্ছিল। কাঁচুমাচু করে বললো:

-আমি বড় সমস্যায় পড়ে গেছি। আমি একটা বড় ধরনের ভুল করে ফেলেছি।

-কী ভুল?

-আমি বাবার সাথে বেয়াদবি করে ফেলেছি। বাবা খুবই রেগে গিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। ছয় মাস হয়ে গেছে, এখনো বাবার রাগ পড়ে নি। আমি এখন কী করতে পারি?

-তুমি বোধ হয় যুক্তিতর্ক করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলে?

-জ্বি।

-আমি বুঝতে পেরেছি। এবার একটা কাজ করতে পারবে?

-কী কাজ?

-এবার বাড়ি গিয়ে, কোনও কথা না বলে সরাসরি তোমার বাবার পায়ের ওপর পড়ে যাবে। মাথা না উঠিয়েই বিনীতভাবে বলবে:

-বাবা! আমার ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দিন।

ছেলেটা এটাই করলো। ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। ছেলে কোনও জবাবের ধারেকাছেই গেল না। চুপচাপ পিতার পায়ের ওপর পড়ে গেলো। পিতা প্রথমে শক্ত হয়ে থাকলেও পরে নরম হয়ে গেলেন। ছেলেকে উঠিয়ে বুকে টেনে নিলেন।

কয়েক মিনিটেই ছয় মাসের রাগ উবে গেলো।

তিন: দাঙ্গা

আমি এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। এক মফস্বল শহরে। বন্ধুকে দেখলাম খুবই চিন্তিত। বাড়ির অন্যরাও উৎকণ্ঠিত। নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম, সেখানেও মুসল্লিদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। জানতে চাইলাম:

-ব্যাপারটা কী?

উত্তরে তারা যা বললো তার সারমর্ম হলো:

-আজ বিকেলে এলাকার হিন্দুদের একটা শোভাযাত্রা বের হবে। আমরা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি, হিন্দুরা এবার বেশ প্রস্তুতি নিয়েই আমাদের মুসলিম পাড়ায় শোভাযাত্রা নিয়ে আসবে। তারা কিছু একটা ঘটানোর পাঁয়তারা কষছে। ব্যপারটা বেশ ঘোলাটে হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। তাদের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের সাড়া পাই নি।

আমি তাদের পুরো বক্তব্যটা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। একটু চুপ থেকে বললাম:

-আমার একটা কথা যদি আপনারা শুনেন তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আজ কোনও সমস্যা হবে না।

-বলুন।

-আপনারা বেশ কিছু ফুলের মালা যোগাড় করে রাখুন। বিকেলে যখন শোভাযাত্রা এখানে আসবে, আপনারা তাদের সামনের সারিতে থাকা নেতৃস্থানীয় লোকগুলোকে মালাগুলো পরিয়ে দেবেন। এরপর দেখুন কী ঘটে!

আমি যেমনটা ভেবেছিলাম তাই ঘটলো। বিকেলে হিন্দুরা বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে এল। রীতিমতো রণপ্রস্তুতি। তাদের উস্কানিমূলক আচরণ দেখে মুসলমানদের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। শোভাযাত্রা যখন মসজিদের সামনে এল, আগে থেকে ঠিক করা লোকেরা এগিয়ে গিয়ে হিন্দু নেতাদের গলায় মালা পরিয়ে দিল। পুরো শোভাযাত্রা ব্যাপারটা দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। পরক্ষণেই সবাই উল্লাসে ফেটে পড়লো। মুসলমান জিন্দাবাদ বলে নারা দিতে শুরু করলো। তারা খুশি মনেই শোভাযাত্রা নিয়ে চলে গেলো। দুই ধর্মের অনৈক্যের দিনটা ঐক্যের দিনে পরিণত হল।

চার: বিদ্বেষী

বাঙ্গালোরে আমাদের বাড়ির অদূরে, একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। একটা গাড়ি এসে হঠাৎ করে মেরে দিলো। আমি রাস্তা থেকে

ছিটকে পড়লাম। বেশ খানিকটা আহতও হলাম। চালক তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এল। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল।

আমি চালকের দিকে তাকিয়ে (আমার গুরতর অবস্থার মধ্যেও) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ লোকটা ছিলো চরম মুসলিম বিদ্বেষী। মুসলমানরা সবাই তাকে ঘৃণা করতো। এই অবস্থায় তারা যদি এই লোককে হাতের নাগালে পায়, কী যে হবে ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠলো। আমি লোকটাকে বললাম:

-ভাই! আমার কথা চিন্তা করবেন না। আপনি তাড়াতাড়ি এই এলাকা ছেড়ে চলে যান। আপনাকে মুসলমানরা দেখতে পেলে রেগে যেতে পারে। আগে আপনি বাঁচুন।

লোকটা আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারলো। তাড়াতাড়ি অকুস্থল ত্যাগ করলো। দুদিন পর সন্ধ্যায়, লোকটা আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলো। সেদিন দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। লোকটার মুসলিম বিদ্বেষ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হলো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪০

গুয়ান্তানামো

আদালতে এক মামলা দায়ের হলো। স্ত্রী তালাকের আবেদন জানিয়ে মামলা করেছে।

উকিলের জেরার মুখে ঘটনার যে বিবরণ বের হয়ে এসেছে তা নিম্নরূপ:
-আপনি কেন স্বামীর কাছে তালাকের আবেদন করছেন?
-গুয়ান্তানামোর জন্য।
-গুয়ান্তানামোর জন্য? বিষয়টা খুলে বলুন।
-আমার স্বামী আমাকে গুয়ান্তানামো বলে ডেকেছে।
-কিভাবে? কখন ডেকেছে? সবসময় এই নামেই ডাকে?
-না না, মুখে ডাকে নি। মোবাইলে।

একদিন আমার স্বামী অফিসে যাওয়ার সময়, ভুলে মোবাইল রেখে রেখে গেছে। অফিসের নাম্বার থেকে ফোন করে জানালো মোবাইলটা বাসায় রেখে গেছে কিনা একটু খুঁজে দেখতে।

আমি অনেকক্ষণ খুঁজেও পেলাম না। পরে ভাবলাম একটা কল দিয়ে দেখি। দিলাম কল। রিং বেজে উঠলো। আমাদের সোফার ফাঁকে পড়ে ছিলো। মোবাইলটা।

তখনও রিং বাজছিলো। আমি হাতে ওখানে নাম উঠেছে 'গুয়ান্তানামো'।

আমার মাথায় চিন্তা এলো, কী! আমি গুয়ান্তানামো জেলখানা? আমার সাথে সংসার করে গুয়ান্তানামো জেলখানার মতো নির্যাতিত হচ্ছে? আমি আমেরিকানদের মতো একজন কসাই? বন্দীকে আটকে রেখে অকথ্য নির্যাতন চালাই?

এই নাম আমার জন্য চরম অপমান। এই সতের বছরের দাম্পত্য জীবনে আমি অনেক অবহেলা সহ্য করেছি। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছি। আর নয়। আমি এবার মুক্তি চাই।

নতুন করে বাঁচতে চাই। সতের বছর আমি নিজেই বন্দী ছিলাম।

উকিল স্বামীর কাছে জানতে চাইলেন। এমন নামে স্ত্রীর নাম্বার সেভ করার কারণ কী?

-ও আসলে বিষয়টা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। আমি ওসব চিন্তা করে এটা করি নি।

আমি দেখেছি, ও শত কষ্টেও ধৈর্য ধরে থাকতে পারে। শত অপমানও মুখ বুজে সহ্য করতে পারে। আমার অনেক অন্যায় আচরণ-আবদারকেও সে হাসি মুখে মেনে নেয়।

আমাদের সংসার টিকিয়ে রাখতে তার অবদানের কথা মনে রেখেই আমি এই নাম বেছে নিয়েছি।

গুয়ান্তানামো কারাগার থেকে যেমন কেউ কোনদিন পালাতে পার না, কেউ এই কারাগার কোনওদিন ভাঙতে পারবে না, আমাদের সংসারও কোনও দিন ভাঙবে না। যতদিন ও বেঁচে আছে, ততদিন আমাদের সংসার গুয়ান্তানামো কারাগারের মতোই দুর্ভেদ্য।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪১

লোকটা কে?

বুশ গেলেন ব্রিটেন। রানি বুশকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। বুশের বেজায় আগ্রহ, কিভাবে বিশ্ব শাসন করা যায়, সেটা রানির কাছ থেকে জেনে নিবেন। লরা বুশকেও বলে রেখেছেন, ভুলে গেলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে।

রাতে সুযোগ পেয়ে রানিকে বললেন:

-ব্রিটেন দেশ চালানো হয় কীভাবে?

-কেন, বুদ্ধি দিয়ে!

-যেমন?

-আচ্ছা, এই যে টনি ব্লেয়ার। ওকে আমি একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব। তাহলেই বুঝতে পারবে। বিষয়টা তোমার কাছে খোলাসা হয়ে যাবে।

: আচ্ছা টনি, বলো তো, একটা লোক, সে তোমার বাবার ছেলে, সে তোমার মায়ের ছেলে, কিন্তু তোমার আর কোন ভাইবোন নেই। তাহলে লোকটা কে?

-(টনি উত্তর দিল) ইওর হাইনেস! সেটা আমি।

-দেখলে, টনির কত বুদ্ধি? এভাবেই বুদ্ধি দিয়ে টনি ব্লেয়ার দেশ চালায়।

বুশ আমেরিকায় ফিরে গেলেন। বিমানবন্দরে দেখা হলো কন্ডোলিৎসা রাইজের সাথে। বুশের আর তর সইছিলো না। কখন রাইজের বুদ্ধি যাচাই করবেন। ভেবেছিলেন কলিন পাওয়েলকেই প্রশ্নটা করবেন। এখন রাইজকেই প্রশ্নটা করে দেখি।

-বলো তো, একটা মানুষ; সে তোমার বাবার সন্তান, সে তোমার মায়ের সন্তান, তোমার আর কোনো ভাইবোন নেই, মানুষটা কে?

রাইজ তখন নিশ্চুপ। কী কঠিন ধাঁধা রে বাবা!

তখন বুশ বললেন, আচ্ছা মন্ত্রী পরিষদেই প্রশ্নটা করি।

মন্ত্রীপরিষদের কেউই উত্তর দিতে পারলো না। আচ্ছা, কলিন পাওয়েল কোথায়? ডাকো তাকে।

-আচ্ছা পাওয়েল বলো তো:

একটা লোক, সে তোমার বাবার ছেলে, সে তোমার মায়ের ছেলে, তোমার আর কোনো ভাইবোন নেই, লোকটা কে?

-সেটা আমি।

-তোমার উত্তর হয় নি, মার্কিনিরা আসলেই গাধা জাতি! মাথামোটা জাতি।

আরে সে লোকটা তো টনি ব্লেয়ার।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪২

মায়ের সেবা

ওয়াং হি। চীনের অধিবাসী। বয়স সত্তর। এখনো বিয়ে করে নি। দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হয় মায়ের সেবায়। মায়ের বয়স ছিয়ানব্বই। গত দশ বছর যাবত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। নড়াচড়া করতে পারেন না।

ওয়াং হি মাকে গোসল করিয়ে দেয়। খাইয়ে দেয়। মায়ের সাথে কথা বলে। মজার মজার গল্প পড়ে শোনায়।

মা কথা বলতে পারেন না। তারপরও ওয়াং হি বারবার মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন:

মা! আমার আশা আপনি একশ বছরেরও বেশি বাঁচবেন।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৩

সেই বোনেরা

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। বুকোবার্না। আলজেরিয়ার প্রত্যন্ত এক শহর। ফরাসি জেনারেলের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে, এই শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোতে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদরা আত্মগোপন করে আছে।

এক গভীর রাতে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়া হলো। চোখ ডলতে ডলতে ব্যারাক থেকে বের হলাম।

আমরা নয়টা জিপে করে রওয়ানা দিলাম। বিরকাহ্ গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল হয়ে গেলো। আমরা গ্রামে প্রবেশের আগেই পুরুষরা সবাই পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। পুরো গ্রাম পুরুষশূন্য।

আমরা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়েও কিছু পেলাম না। পুরুষ তো নেই নেই, একজন উপযুক্ত মহিলাও চোখে পড়লো না। ঘরে আছে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর বৃদ্ধরা।

আমরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, গ্রামের মহিলারা সবাই, যার যার ঘরে ঘোড়ার আস্তাবলে গিয়ে ঢুকেছে। ওখানে সবাই নিজেদের গায়ে ঘোড়ার পেশাব আর বিষ্ঠা মাখাচ্ছে। আরো অনেক মহিলাকে দেখলাম সরাসরি মানুষের মলই শরীরে মাখছে।

আমাদের অনেকের মনে দুরভিসন্ধি থাকলেও, মহিলাদের গায়ের বোটকা গন্ধে কাছে ভিড়তে রুচিতে কুলোল না।

এক মহিলাকে প্রশ্ন করলামঃ

-তোমরা সবাই একাজ করছো কেন?

-নিজেদের ইফফাত (সতীত্ব) বাঁচাতে।

-এই দুর্গন্ধ সহ্য করছো কিভাবে?

-চিরতরে সতীত্বহানির দুর্গন্ধের চেয়ে ক্ষণিকের এই দুর্গন্ধ কি খুব একটা ধর্তব্যের বিষয়?

(একজন ফরাসি সৈনিকের দিনলিপি থেকে সংগৃহীত।)

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৪

পিতার সেবা

পিতার বয়েস একশ তিন। পুত্রের বয়স ছিয়াত্তর। পিতা মাকিলযন। ছেলে স্টীভ।

স্টীভ প্রতিদিন তার কাজ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির জন্য ব্যয় করে বারো ঘন্টা। পরিবারের জন্য ব্যয় করে ছয় ঘন্টা।

বাকি ছয় ঘন্টা ব্যয় করে পিতার জন্য। এই ছয় ঘন্টা স্টীভ পিতার হাত ধরে বসে থাকে। টুকটাক কথা বলে। কতক্ষণ পরপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে:

-আব্বু! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার পাশেই আছি।

পিতা বেশির ভাগ সময়ই বেহুঁশ থাকেন। জীবনের শেষ দিনগুলো ডাক্তারের পরামর্শক্রমে পুরোপুরি বিছানায় কাটছে।

(আমার ছেলেবেলায় আমি যেমন আমার পিতার মুখাপেক্ষী ছিলাম, তেমনি পিতার বুড়োবেলায় পিতাও আমার মুখাপেক্ষী।)

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৫

সেকাল একাল

এক:

বিয়ে আগে ছিল:

-আত্মিক স্বস্তি ও জীবনের সুস্থিরতা ও ইবাদত।

বিয়ে এখন (অনেকের কাছে):

-সামাজিক প্রথা ও প্রদর্শনী।

দুই:
বন্ধুত্ব আগে ছিলো:
-অমূল্য রত্নভাণ্ডার।
বন্ধুত্ব এখন:
-স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার।

তিন
আত্মীয়-স্বজন আগে ছিলো:
-নিজের খুঁটি। বিপদাপদের অবলম্বন।
আত্মীয়-স্বজন এখন:
-নিছক শত্রুতার আকর।

চার:
শুধু একটা বিষয় আগে যেমন ছিলো আজো তেমনই আছে। আব্বু-আম্মু।
আব্বু-আম্মু আগে ছিলেন:
-পরম স্নেহশীল অনুপম মমতাময়ী।
আব্বু-আম্মু এখনো:
-পরম স্নেহশীল অনুপম মমতাময়ী।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৬

শিশুকে

একটা লেখা পেলাম, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:
এক: আপনার শিশুকে বলবেন না:
-দেয়ালে ছবি এঁকো না।
বরং তাকে বলুন:
-তুমি তোমার খাতায় ছবি আঁকো, আঁকা শেষ হলে ছবিটা দেয়ালে বা ফ্রিজের ওপর বা বোর্ডে লটকে দিবে।
দুই: সন্তানকে বলবেন না:
-উঠো! নামায পড়ে নাও, না হলে জাহান্নামে যাবে।
বরং তাকে বলুন:
-চলো! একসাথে নামাযটা আদায় করে নেই, তাহলে জান্নাতেও একসাথে থাকতে পারবো।

তিন: আপনার সন্তানকে বলবেন না:

-এই তোমার কামরাটা পরিষ্কার করে নাও, ইশ! খোঁয়াড় বানিয়ে রেখেছে কামরাটাকে।

বরং তাকে বলুন:

-তোমার কামরাটা কি তুমি একাই গোছাতে পারবে? নাকি আমি সাহায্য করবো? তুমি তো সবসময় একাই সবকিছু গুছিয়ে রাখো।

চার: সন্তানকে বলবেন না:

-হয়েছে। খেলাধুলা ছেড়ে এবার পড়তে বসো। খেলার চেয়ে পড়ালেখা গুরুত্বপূর্ণ।

বরং বলুন:

-তুমি তাড়াতাড়ি আজকের পড়াটা শেষ করে ফেল, তাহলে পরে খেলার জন্য অনেক সময় পাবে।

পাঁচ: আপনার সন্তানকে বলবেন না:

-এই! দাঁত ব্রাশ করো, আমি না বললে দেখি তুমি দাঁতে হাতই দাও না।

বরং বলুন:

-তুমি তো দেখি আমি বলার আগেই দাঁত পরিষ্কার করে ফেলো!

ছয়: আপনার সন্তানকে বলবেন না:

-বাম কাত হয়ে শুয়ো না।

বরং তাকে বলুন:

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডান কাত হয়ে শুতে শিখিয়েছেন।

সাত: সন্তানকে বলবেন না:

-একদম চকলেট খাবে না। সারাদিন শুধু চকলেট আর চকলেট। দাঁতগুলো তো সব এভাবেই যাবে।

বরং তাকে বলুন:

-তোমাকে দিনে একবার চকলেট খাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে, কারণ তুমি নিজ দায়িত্বেই প্রতিদিন দাঁত পরিষ্কার করে ফেলো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৭

মৌলবাদী হামলা

বিকেল। অফিস ছুটির সময়। নিউইয়র্ক টাইমসের এক ফটো সাংবাদিক বাসায় ফিরছে।

রাস্তার পাশেই পার্ক। একটা ছেলে আপন মনে খেলছে। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর তেড়ে এলো বাচ্চা ছেলেটার দিকে। ছেলেটা প্রাণভয়ে ছুটলো। কুকুরটাও তার পিছু পিছু।

ছেলেটা পার্কের কাঁটাতারের বেড়া বেড়ে উঠে বাঁচার চেষ্টা করছে। কুকুরটাও নাছোড়বান্দা হয়ে লাফিয়ে উঠে কামড়ে ধরেছে ছেলেটার পা।

এক লোক দৌড়ে এলো। জাপটে ধরলো কুকুরটাকে। প্রাণপণ লড়াই শুরু হলো মানুষে আর কুকুরে।

এদিকে ক্লিক ক্লিক শব্দে সাংবাদিকের ক্যামেরা কাজ করে চলেছে। এক সময় মানুষের কাছে কুকুরের পরাজয় হলো।

সাংবাদিক ছুটে গেলেন অকুস্থলে। পুরো ঘটনার আদ্যোপান্ত তার ক্যামেরায় ধরা আছে। আগামীকালের লিড নিউজ করা যাবে। কাছে গিয়ে বীর উদ্ধারকারীর আরো কিছু ক্লোজ শট নিলেন।

-আপনি দারুণ সাহসিকতার কাজ করেছেন। আপনার ছবি আগামীকারের পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হবে:

'এক বীর নিউইয়র্কার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচালো এক শিশুকে'।

-কিন্তু আমি তো নিউইয়র্কের অধিবাসী নই।

-তা হলে আমাদের শিরোনাম হবে:

'এক বীর আমেরিকান নিজের জীবন বাজি রেখে বাঁচালো এক অনাথ শিশুকে'।

-আমি তো আমেরিকানও নই।

-তাহলে আপনি কী?

-আমি সুদানি।

পরের দিন নিউইয়র্ক টাইমসের ভেতরের পাতায় খবরটা ছাপা হলো। ছোট করে। শিরোনাম হলো:

'এক দুর্ধর্ষ মুসলিম মৌলবাদীর হাতে মারা পড়লো অসহায় মার্কিন কুকুর'।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৮

ইমামের কেরাত

রাজা নতুন নামাযী হয়েছেন। নিয়মিত মসজিদে আসছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ইমাম সাহেব এত লম্বা কেরাত পড়েন যে দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল হয়ে যায়।

রাজা বেশিদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। খোলস ছেড়ে বের হয়ে আসলেন। নামাযের পর ইমাম সাহেবকে ডেকে বললেন:

-এত লম্বা কেরাত পড়ার কী আছে? এখন থেকে প্রতি রাক'আতে শুধু এক আয়াত করে পড়বেন। এর বেশি নয়।

ইমাম সাহেব মাগরিবের সময় কেরাত ধরলেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর পড়লেন:

(হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। সূরা আহযাব: ৬৭)।

এক আয়াত পড়েই রুকুতে গেলেন।

প্রথম রাক'আত শেষ হলো। ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর কিরাত মিলালেন:

(হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। এবং তাদের প্রতি এমন লা'নত করুন, যা হবে বড় লা'নত। সূরা আহযাব: ৬৮)।

এক আয়াত পড়েই রুকুতে গেলেন।

নামাজ শেষ হলে রাজা ইমাম সাহেবকে ডেকে বিনয়ের সাথে বললেন:

-হুযুর! নামাযে আপনি যেখান থেকে ইচ্ছা পড়ুন। যত আয়াত ইচ্ছা পড়ুন। কিন্তু দয়া করে এ দুই আয়াত আর পড়বেন না।

জীবন জাগার গল্প : ৩৪৯

পিতার প্রতিচ্ছবি

*** একজন আত্মীয়ের কথা মনে পড়ল। তার নাম ফুয়াদ। মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নি করছে। গল্পটা তাকে নিয়ে। ভেবেছিলাম গল্পটা কয়েকদিন পরেই বলবো। তবুও বিষয়টার অবতারণা করার কারণ হলো, আগেও অনেক

বার এমন পরে লেখার জন্যে রেখে দেয়া বিষয়ে আর লেখা হয়ে ওঠে নি। ভাবটুকু হারিয়ে গেছে। মনের ওপর জোর খাটিয়ে তো আর লেখা যায় না।

*** তিনি পেশায় একজন অধ্যাপক। এসেছিলেন ইজতিমায়। ইজতিমা থেকেই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নিয়ত করেছেন, আপাতত এক চিল্লা লাগানোর ইচ্ছে। চিল্লার শেষদিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভর্তি করা হলো ঢাকার এক হাসপাতালে। দেখাশোনার ভার পড়লো সেই ইন্টার্নি আত্মীয়ের ওপর। তার কাজ শুধু বড় ডাক্তারের সব কিছু গুছিয়ে রাখা। নার্সেরা সব কিছু ঠিকঠাক মতো করছে কিনা তদারক করা।

*** বারবার আসা-যাওয়া করতে করতে, বাপমরা ছেলেটা যেন রুগির মধ্যে পরলোকগত পিতার প্রতিচ্ছবিই খুঁজে পেল। প্রয়োজন ছাড়াও বারবার কেবিনে ঢুঁ মারতে শুরু করলো। টুকটাক কথা হতো। গল্প হতো। মাঝেমধ্যে বাংলাদেশী খাবারও নিয়ে যেতো হাসপাতালে।

*** ছেলেটাকে বড় ভাল লেগে গেল। আল্লাহর রাস্তায় এসে কী এক মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়লেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তার ফাঁকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। ছেলেটার মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু হলো। তার পরিবর্তন দেখে স্বামীহারা উচ্চশিক্ষিতা চাকুরিজীবী মা চিন্তিত। ছেলে কার পাল্লায় পড়ে গেল কে জানে?

*** একদিন ছেলেকে শক্ত করে ধরে বসলেন:

-কিরে তুই ইদানীং কার সাথে চলাফেরা করিস?

-কই, নতুন কারো সাথে তো দেখা-সাক্ষাত হয় নি?

-না হলে তোর মধ্যে হঠাৎ নামায-কালামের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হলো কোত্থেকে?

-ও আচ্ছা, আমাদের হাসপাতালে একজন ভদ্রলোক ভর্তি হয়েছেন। তিনি সুইজারল্যান্ডের লোক। থাকেন কানাডায়। বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতে এসেছেন।

-উনি বুঝি তোকে তাবলীগের মুসল্লি হওয়ার জন্যে বলেছে?

-না তেমন কিছু বলেন নি। অনেক দিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে তো, তিনি আমাকে শুধু নামায পড়তে উৎসাহিত করলেন। তবে....

-তবে কি?

-না ইয়ে মানে, তিনি বলেছেন, আমি চাইলে কানাডায় গিয়েও পরবর্তী লেখাপড়াটা করতে পারি। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তার একমাত্র মেয়েও মেডিকেল কলেজে পড়ে।

-না না, বাপু তোর ওসব কানাডা-ফানাডা গিয়ে কাজ নেই। আর ওই বুড়োর সেবাযত্ন করেও তোর কাজ নেই। তুই ওই বুড়োর কেবিনের ধারেকাছেও ঘেঁষবি না বলে দিলাম। কোথাকার কে, আমার ছেলেকে কেড়ে নিতে এসেছে।

-তুমি কি যে বলো আম্মু! আমাকে কেড়ে নিতে যাবেন কোন দুঃখে? আমাকে দেখে তার ভাল লেগেছে এই যা। তোমার বিশ্বাস না হলে, একদিন আঙ্কেলের সাথে কথা বলেই দেখ না!

-এর মধ্যে আঙ্কেলও পাতিয়ে বসেছিস। তুই সত্যি করে বলতো, লোকটা আসলে কি চায়?

-তুমি শুধু শুধু সহজ একটা বিষয়কে পেঁচিয়ে ফেলছো। তার স্ত্রী মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। একমাত্র মেয়েকে নিয়েই আছেন। এখন তার ধর্ম কর্মে মতি হয়েছে। তাই তাবলীগে বের হয়েছেন। অবশ্য একটা দিক দিয়ে তোমার সাথে ভদ্রলোকের মিল আছে। তোমার মতো তিনিও একটা ভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রির (প্রাণ রসায়ন) অধ্যাপক।

- এমন লোক তাবলীগে কী করতে এসেছে?

-কি বলছো তুমি! তাবলীগে বুঝি মূর্খ-অশিক্ষিতরাই যায়? তার সাথে কানাডা থেকে যে সাতজন এসেছে, ওদের কোয়ালিফিকেশন দেখলে তো তুমি রীতিমতো হার্টফেল করবে!

-ও, তাদের সাথেও বুঝি তোর পরিচয় হয়ে গেছে?

-হবে না! পালা করে তারা সবাই তো হাসপাতালে থাকতে আসে।

*** আর শোন আম্মু! আঙ্কেল বলেছিলেন, সরাসরি তোমার সাথে আমার ব্যাপারে কথা বলবেন।

-তোর ব্যাপারে আমার সাথে কী কথা?

-আহা! বলেই দেখ না! তোমার সাথে তো মুখোমুখি হতে পারবেন না। ফোনেই কথা বলতে চান। আর শোন আমার ব্যাপারটাতে একটু বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিও। চট করে তাকে কোনও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিও না।

-আচ্ছা, ঠিক আছে আগে তার কথা শুনে দেখি না। যৌক্তিক হলে, ফিরিয়ে দেব কেন?

*** ফুয়াদ কিছুদিন পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, আম্মু নানুর কাছ থেকে নামাযের দু'আগুলো জানতে চাইছে। পাসপোর্টটা রিনিউ করা যায় কিনা খোঁজ খবর করছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৫০

জিবরাঈলের মৃত্যু

এক আরব ছাত্রের অভিজ্ঞতা। ফুয়াদ খাদাল। সে বললো:

- যখন আমি আমেরিকায় পড়তে গেলাম, প্রতিদিন ডরমিটরিতে একজন যাজক এসে আমাদেরকে খৃস্টবাদের দাওয়াত দিতো।

আমরা কিছু বলতেও পারছিলাম না। সইতেও পারছিলাম না। চরম বিরক্তিকর অবস্থা। শেষে আমি এক বুদ্ধি বের করলাম। আমার সাথে থাকা আরেক মুসলিম ছাত্রকে বললাম:

-আগামীকাল, যখন যাজক আসবে, তুমি কথার মাঝখানে বাহির থেকে এসে, আমার কানে কানে কিছু একটা বলার অভিনয় করবে।

পরদিন যাজক মশায় বাইবেল হাতে এলেন। প্রতিদিনের মতো, ঘ্যান ঘ্যান শুরু করলেন। খৃস্টান হলে কী কী লাভ বোঝাতে শুরু করলেন।

এমন সময় পরিকল্পনা মাফিক, বন্ধুটা এসে ফুয়াদের কানে কানে কিছু একটা বললো। কথাটা শুনেই ফুয়াদ হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলো।

যাজক ভাবলেন, দেশ থেকে কোনও দুঃসংবাদ এসেছে। জানতে চাইলেন

-কী হয়েছে? অমন করে কাঁদছো কেন?

-এতবড় দুর্ঘটনার কথা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না।

-আচ্ছা, বলেই দেখো না।

-এই মাত্র, আমার বন্ধুর কাছে খবর এসেছে, ফিরিশতা জিব্রাঈল মারা গেছেন।

-যাহ্, তা কি করে হয়? ফিরিশতা কখনো মরতে পারেন না। তুমি আমাকে বানিয়ে বলছো।

-তাহলে আপনি কিভাবে আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন, ঈশ্বর ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনদিন মৃত অবস্থায় ছিলেন?

জীবন জাগার গল্প : ৩৫১

মদের যুক্তি

এক খৃস্টান দাওয়াত দিলো তার মুসলিম প্রতিবেশীকে। বিরাট আয়োজন।

খাওয়া-দাওয়ার মূল পর্ব শেষ হলো। এবার চলছে ফলাহার। নানা রকমের ফলের খাঞ্চা সামনে রাখা হলো। প্রথমেই পরিবেশন করা হলো আঙুর। তার সাথে ঘরোয়াভাবে তৈরি আঙুরের বিশেষ চোলাই।

মুসলিম বন্ধু বললেন:

-ভাই! আঙুর চলতে পারে, কিন্তু আঙুরের চোলাই চলবে না। ওটা খাওয়া আমাদের জন্য হারাম।

-কেন রে ভাই? এটা তো খুবই আশ্চর্যজনক কথা। তোমাদের মুসলমানদের কাজটা বড়ই অদ্ভুত। আঙুরকে হালাল বলো অথচ আঙুর থেকে তৈরি চোলাইকে হারাম বলো। অথচ এটা (চোলাই) ওটা (আঙুর) থেকেই বের হয়েছে?

মুসলমান বন্ধু বললো:

-তুমি কি বিয়ে করেছো তো?

-জ্বি করেছি। না হলে এত আয়োজন করলো কে?

-তোমার ছেলে-সন্তান কী?

-এক মেয়ে দুই ছেলে।

-তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো, তোমার স্ত্রী তোমার জন্য হালাল। আর তোমার কন্যা তোমার জন্য হারাম। অথচ সে (কন্যা) তো তার (স্ত্রী) থেকেই বের হয়েছে?

জীবন জাগার গল্প : ৩৫২

দুর্বল হাদীস

সুদানের উম্মে দারমান শহর। জুমার দিন ইমাম সাহেব বয়ান করছেন:

-কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে। ফিরিশতারা তাকে ঘিরে ধরবে। সসম্মানে তাকে বিরাট এক প্রাসাদে নিয়ে যাবে। প্রাসাদের প্রবেশ পথেই দেখতে পাবে অনিন্দ্য সুন্দর হুরদেরকে। মুমিন বান্দা হুর দেখে সেদিকে ছুটে যেতে উদ্যত হবে। ফিরিশতারা তখন বলবে:

-জনাব! একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার জন্য বিশেষ হুরের ব্যবস্থা করা আছে। ওই যে বিশেষ কক্ষে আপনার অপেক্ষা করছে।

মুমিন বান্দা তখন অধীর হয়ে সেই প্রকোষ্ঠের দিকে ছুটে যাবে। গিয়ে দেখবে, সেখানে তার দুনিয়ার স্ত্রী অপেক্ষা করছে।

খতীব সাহেব একথা বলতে না বলতেই একজন বেদুইন তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলো। চীৎকার করে বলে উঠলো:

-ইয়া শায়খ মাহলান! থামুন থামুন, আর বলবেন না। হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করুন। এই সাত সকালেই মসজিদের নাম করে ঘর থেকে বের হয়েছি। একটা দিন অন্তত শান্তিতে কাটাবো বলে। এখানেও দেখি আপনি তার আলাপ শুরু করে দিলেন।

ইয়া শায়খ! আপনি হাদীসটা আবার ভালোভাবে দেখে আসুন, আমার মনে হয় হাদীসটা দুর্বল।

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৩

ডিম-পেঁয়াজ

সম্রাট আকবরের দরবার। নানা জ্ঞানীগুণীর আনাগোনা। নবরত্ন তো স্থায়ীভাবেই দরবার আলোকিত করে আছে। এই নবরত্নের দুইজন হলো মোল্লা দো-পেয়াজা আর রাজা বীরবল।

এ দুই রত্নের মধ্যে সবসময় প্রতিযোগিতা লেগেই থাকতো। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক হতো। সেবার ঠিক হলো দুজনের মধ্যে পৃথিবী নিয়ে বিতর্ক হবে। সম্রাট আকবরও নড়েচড়ে বসলেন। যাক অনেক দিন পর একটা মনোজ্ঞ বিতর্ক উপভোগ করা যাবে।

রাজা বীরবল অনেক জ্ঞান রাখেন। কিন্তু মোল্লা দো-পেয়াজা শুধু পকেটে দুইটা পেঁয়াজ নিয়েই ঘোরাঘুরি করা নিয়ে ব্যস্ত।

দরবার উপচে পড়ছে। কী হয় কী হয় ভাব। যেনানা মহলও দরবার আলো করে হাযির হলো। বিতর্ক শুরু হলো। মোল্লা দো- পেয়াজা প্রশ্ন করলো:

-মহারাজ! পৃথিবী কী?

রাজা বীরবল, আচকানের পকেট থেকে একটা ডিম বের করে হাত উঁচিয়ে দখালো।

এবার মোল্লার পালা। মোল্লা ডিম দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। মোল্লা কী জবাব দেয়, সে ব্যাপারে কৌতূহল।

মোল্লার পকেটে তো সব সময় দুইটা পেঁয়াজ থাকে। তো মোল্লা একটা পেঁয়াজ পকেট থেকে বের করে উঁচিয়ে দেখালো।

পেঁয়াজ দেখেই রাজা বীরবল, হার মেনে নিল। সম্রাটকে জানালো:

-জাহাঁপনা! মোল্লাজি সত্যিই আমার চেয়ে জ্ঞানী। উনি পৃথিবীর যে ব্যাখ্যা দিলেন, আমার পক্ষে সেটা কল্পনা করাও সম্ভব হয় নি।

-কিভাবে?

-আমি ডিম দেখিয়ে বুঝিয়েছিলাম, পৃথিবীটা ডিমের মতো গোলাকার। আর উনি যখন পেঁয়াজ দেখালেন তখন দেখলাম,

ক. পৃথিবীটাতে শুধু ডিমের মতো মসৃণ নয়। বরং পেঁয়াজের মতো নানা স্তরবিশিষ্ট।

খ. পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগটা ডিমের মতো ভঙ্গুর নয়, বরং পেঁয়াজের শক্ত।

সম্রাট এবার মোল্লাজির দিকে ফিরে বললেন:

-কি হে! তুমি পৃথিবীর ব্যাখ্যায় কী মনে করে পেঁয়াজ দেখালে?

-জাহাঁপনা! আমি তো অতশত বুঝি না। রাজা মশায়ের মতো অত জটিল-কুটিল প্যাঁচও আমি বুঝি না। উনিই আগে বেড়ে সব সময় আমার সাথে তর্কে জড়ান। আমি যখন দেখলাম তিনি পকেট থেকে একটা বড়সড় ডিম বের করে আনলেন। তখন আমার মনে পড়ে গেলো, আমি আজ সকালে দরবারে আসার আগে নাস্তা করে আসতে পারি নি। আমার পেটের ক্ষুধা আরো চাগিয়ে উঠলো। ভাবলাম:

-এমন খাসা একটা ডিমকে পেঁয়াজ দিয়ে তেলে ভাজা করে খেতে মন্দ লাগবে না! সেটা ভেবেই পেঁয়াজটা ওনাকে দেখালাম। আর উনি এখান থেকেও কিভাবে যেন পৃথিবীর প্যাঁচ আবিস্কার করে বসলেন।

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৪

আসল দেখা

শিকারী দিনশেষে বাড়ি ফিরে এল। আজ ফাঁদে অনেকগুলো চড়ুই ধরা পড়েছে। শিকার করা পাখিগুলো জবেহ করতে বসলো। একটা করে জবেহ করছে, আর পরিবারের সবাই মিলে সেটার পালক ছাড়িয়ে রান্নার জন্য প্রস্তুত করছে।

তখন ছিল শীতকালীন মৌসুম। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ আর কনকনে ঠাণ্ডায় শিকারীর দু'চোখ থেকে পানি ঝরছিলো। এটা দেখে একটা চড়ুই আরেক চড়ুইকে বলল:

-দেখ, দেখ! শিকারীর মনটা কী নরম। আমাদেরকে জবেহ করার শোকে চোখের পানি আটকাতে পারছে না। আহ! তার মনটা কত নরম!

এটা শুনে আরেক চড়ুই বললো:

-আরে বোকা তার চোখের পানি দেখে ভুলো না। তার হাতের কাজের দিকে দেখ।

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৫

নামে কাম হয় না

ছোট্ট মেয়ে মায়ের পাশে বসে পুতুল খেলছে। আপন মনে কথা বলছে। মা খেয়াল করে শুনলেন সে কী বলছে:

-পুতুলমণিরা! তোমরা দু'জন আমার ছেলে। তোমরা কি জানো, বড় হলে আম্মুর মতো আমারও ছেলেমেয়ে হবে। আমার দুইটা ছেলে হবে। একজনের রাখবো উমর ইবনে খাত্তাব। আরেকজনের নাম রাখবো উমর ইবনে আবদুল আযীয।

তোমরা জানো, কেন এই নাম রাখবো? আম্মু গতকাল শোয়ার আগে গল্পের সময় বলেছেন:

-এই দু'জন খুবই ভালো মানুষ। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা খুবই ভালোবাসেন। আমিও আমার ছেলেদের এই নাম রাখবো, তাহলে ছেলেরাও দুই উমরের মতো হবে।

মা আর থাকতে না পেরে হেসে বললেন:

-না মা! শুধু নাম রাখলেই মানুষ ভাল হয়ে যায় না।

-তাহলে আম্মু?

-ভালো নাম রাখার পাশাপাশি সন্তানদের ভালোভাবে লালন-পালন করাও জরুরী। তুমি দেখনা আমাদের আশেপাশে কত উমর, কিন্তু কয়জনকে তাদের দু'জনের মতো হতে দেখেছ?

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৬

মেঘের উচ্চতা

শয়তান: কতজন আসবে। কতশত যুবক আসবে। কত লোলচর্ম বৃদ্ধ আসবে তোমার পাণিগ্রহণ করতে। আর তুমি কিনা নিজেকে ঢেকে রেখেছ?

অন্তরালবর্তিনী: আসুক না। তাতে সমস্যা কোথায়?

শয়তান: আরে সমস্যা মানে? কত সমস্যা তুমি কিভাবে জানবে। তুমি তোমার আপাদশির বোরখাবৃত করে রেখেছ। একটা ঘাসকেও তো ঢেকে রাখলে সেটা মলিন হয়ে যায়। বিবর্ণ হয়ে যায়। সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তোমার এই সৌন্দর্য, তারুণ্যের ঔজ্জল্য বোরখার আড়ালেই তো ম্রিয়মান আর নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

অন্তরালবর্তিনী মুচকি হেসে বলল:

-আমার চূড়ান্ত লক্ষ হলো আমার রবের সন্তুষ্টি। আমি এমন মিষ্টি হতে রাজি নই যার ওপর মাছি ভনভন করছে।

আমি এমন গোশতের টুকরা হতেও রাজি নই যেটাকে মানুষের লোলুপ দৃষ্টির বিষদাঁত ছিঁড়েখুঁড়ে খায়।

আমি হিজাব পরেছি আমার ঈমান রক্ষার্থে। হিজাবের মধ্যেই আমি নিজেকে মেঘের উচ্চতায় আসীন বলে অনুভব করি।

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৭

মোহরানা

এক যুবক তার বন্ধুকে সাথে করে পাত্রীর বাবার অফিসে গেল। বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

বন্ধু: জনাব! আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম।

পিতা: বল।

বন্ধু: বলছিলাম কি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আপনার ঘরে একটা বিয়ের আয়োজন হতে পারে।

পিতা: পাত্রটা কে?

বন্ধু: এই যে, আমার বন্ধু।

পিতা: ঠিক আছে, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে কথা সামনে অগ্রসর হবে।

বন্ধু: জ্বি ঠিক আছে।

পিতা: বলো তো আজ ফজরের জামাত কয়টায় দাঁড়িয়েছে?

পাত্র: ইয়ে মানে ঠিক বলতে পারছি না।

পিতা: তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। আমার মেয়ের মোহরানা অনেক বেশি। সেই মোহরানা তোমার কাছে নেই।

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৮

সুন্দর গুণাবলীর তালিকা

লুবাইনা ফাইয়ায। একজন শিক্ষিকা। থাকেন লেবাননের এক উদ্বাস্তু শিবিরে। প্রেসিডেন্ট মুরসি ক্ষমতায় আসার কিছুদিন তিনি কিছুদিনের জন্য গাযায় এসেছিলেন বেড়াতে। এখানে আম্মু-আব্বু থাকেন। কতদিন তাদের সাথে দেখা হয় নি! সেই যে আহত হয়ে, রাফাহ সীমান্ত দিয়ে, চিকিৎসার জন্য মিসরে গিয়েছিলেন, আর ফেরা হয় নি। আটকা পড়ে গিয়েছিলেন ওপারে, আর ফেরার সুযোগ হয় নি। পরে মিসর থেকে নানা পথ পাড়ি দিয়ে স্বামীসহ লেবাননে গিয়ে উঠেন। সেখানেই এতটা বছর কেটে গেছে। মনটা সারাক্ষণই সীমান্তের এপারে পড়ে থাকতো। কিন্তু কিছুই করার ছিলো না।

তার এই কষ্টের কথাগুলো তিনি লিখে রাখতেন ব্যক্তিগত ডায়েরিতে। ডায়েরি লেখার অভ্যেস লুবাইনা পেয়েছেন দাদার কাছ থেকে। তিনিও নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তার ডায়েরিতে বলতে গেলে পুরো ফিলিস্তীনের ইতিহাসই ধরা আছে। ইহুদিদের ন্যক্কারজনক বর্বর অত্যাচারের রক্তাক্ত কাহিনী ডায়েরির প্রতিটি লাইনে ধরা আছে।

তার ডায়েরির পাতা থেকে একটা থেকে:

পহেলা শাওয়াল / ১৩৪৫ হিজরি।

আমাদের মহল্লার নাম 'বিনইয়াতুশ শাব'। গাযার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। আমাদের মহল্লাও ঈদের প্রস্তুতি নিচ্ছিল অবিরাম বোমাবর্ষণ আর বিমান হামলার মধ্যেই। কিন্তু একটা সংবাদে পুরো গাযাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিমান হামলায় ঈদের দিনও কয়েকজন নিষ্পাপ শিশু, পার্কে খেলা করা অবস্থায় শহীদ হয়েছে।

আমি মন খারাপ করে বাগানে জলপাই তুলতে গিয়েছি। তখন একটা দুঃসংবাদ শুনে আমার পুরো অস্তিত্বটাই নড়ে উঠলো। আমার মন চলে গেল অনেক আগের একটা স্মৃতিতে।

-আমি সবেমাত্র পড়ালেখা শেষ করে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দিয়েছি। শহীদ ইয়াসিন স্কুলে। এই স্কুলে নিয়ম ছিলোঃ

-স্কুলে নতুন শিক্ষক এলে, তাকে প্রথম শ্রেণী দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হতো। এই শ্রেণীর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষকের কাছেই থাকতো। একেবারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই একজন শিক্ষকের অধীনেই ছাত্ররা সব কিছু করতো। এতে কিছু খারাপ দিক থাকলেও, ভালো দিক ছিলো অনেক। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কটা হতো দেখার মতো। শিক্ষক প্রতিটি ছাত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেন। ছাত্ররাও শিক্ষককে তাদের অতি আপনজন ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো।

প্রথম প্রথম এতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যেতাম। পরে আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়েছি। সবচেয়ে কঠিন ছিলো ছানাপুনোগুলোর দুষ্টুমি নিয়ন্ত্রণ করা। এককেটা এত বেশি দুষ্টুমি করতো যে বুঝিয়ে শুনিয়ে পড়তে বসাতে হাঁফ ধরে যেতো। একজন ছিলো সে একাই এক হাজার। বিসাম ফায়িক। তাকে বাগে আনা ছিলো অসম্ভব একটা কাজ। তবে একটা বিষয় ছিলো লক্ষ্যণীয়, বিসাম যতই দুষ্টুমি-খুনসুটি করুক, সে কখনো অভদ্র আচরণ করতো না। ডাক দিলে শুনতো। যদিও পরক্ষণেই আবার ভুলে যেতো।

বিসামের আচরণগুলো ছিলো এমন যে, সবাই তাকে দেখলেই হাসতে শুরু করতো। এজন্য অনেক সময় তাকে শাসন করতে গিয়েও হাসি আটকানো মুশকিল হয়ে পড়ে। এতকিছুর পরও বিসামের অনেক গুণ ছিলো। সে মনোযোগ দিয়ে পড়লে সবার আগে পড়া মুখস্থ করে ফেলতে পারতো। বুঝিয়ে-শুনিয়ে কোন কাজ করতে দিলে, সে সবার চেয়ে ভালভাবেই কাজটা করে দিতো।

তবুও মাঝেমধ্যে তার অতি দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম। একদিন ক্লাশে সে অন্যদিনের তুলনায় বেশি কথা বলছিলো। আমি নিষেধ করলেই সে জিবে কামড় দিয়ে বলছিলোঃ

-আর কথা বলবো না আপু।

কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করতো। আমি তখনো নতুন শিক্ষক ছিলাম। ধৈর্য কম ছিলো। আমি রেগেমেগে থাকতে না পেরে, একটা ভুল করে

বসলাম। বিসামকে শাসিয়ে দিয়ে বললাম: -বিসাম! আর একটা কথা যদি তোমার মুখ থেকে বের হয়, আমি সোজা গিয়ে তোমার মুখে টেপ এঁটে দিবো।

-ঠিক আছে আপু! আর একটা কথাও বলবো না।

আমি ব্ল্যাকবোর্ডে অংক বোঝানোয় মনোযোগ দিলাম। একমিনিটও গেল না, ক্লাসের সব ছাত্র একযোগে বলে উঠলো:

-আপুমণি! বিসাম আবার কথা বলেছে।

আমি কোনও কথা না বলে ড্রয়ার খুললাম। স্কচটেপটা হাতে নিয়ে বড় বড় দুই টুকরা টেপ ছিঁড়ে বিসামের মুখে 'এক্সের মতো করে এঁটে দিলাম।

বিসাম অবাক হয়ে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। ক্লাসের সবাই তার অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি বোর্ডের লেখায় মনোযোগ দিলাম। অংকটা শেষ করে, বিসামের মুখ থেকে টেপটা খুলে নিলাম। সে বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো:

-আপুমণি! আমার ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার জন্য অনেক শুকরিয়া।

বিসামটা ছিলো এমনি। সে কখন কি কথা বলে, আগে থেকে বোঝা দায়। তার শান্ত আচরণ দেখে আমার মনটাই গেল খারাপ হয়ে। কেন তাকে শাস্তিটা দিতে গেলাম?

একটানা ক্লাস করতে করতে অনেক সময় দেখতাম ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়তো। একটা বিজ্ঞানের ক্লাসে একটা বিষয় কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম। ছাত্ররাও মনোযোগ দিতে পারছিলো না। তখন আমি একটা বুদ্ধি বের করলাম। সবাইকে বললাম:

-তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় ক্লাসের সব ছাত্রদের নাম লেখ। দুই নামের মাঝে এক লাইন ফাঁকা জায়গা রাখবে।

-লিখেছি আপুমণি!

-ঠিক আছে, এবার একটা কাজ করো, প্রত্যেকের নামের নীচে তার সম্পর্কে তোমার ভালো লাগা একটা গুণের কথা লিখ। লেখা শেষ হলে কাগজগুলো জমা করে আমার কাছে জমা দিয়ে যাবে।

এরপর থেকে যখনই ছাত্রদের মন খারাপ থাকতো বা তারা অমনোযোগী হতো, তাদেরকে এই কাজ করতে দিতাম। রাতে বাসায় এসে আমি সবার কাগজগুলো নিয়ে বসতাম। কে কী লিখেছে পরম আগ্রহে পড়তাম।

ক্লাসে ছিলো পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র। আমি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা খাতা বানিয়েছিলাম। প্রতিবার যে মন্তব্যগুলো জমা হতো, সেগুলো কেটে কেটে যার যার খাতায় এঁটে রেখে দিতাম। প্রত্যেকের মন্তব্যের পাশে আমিও একটা প্রশংসাসূচক কথা লিখে রাখতাম।

একটা নমুনা দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে:

বিসাম সম্পর্কে সব সময় তার পাশে বসা কাতিফ উজলান লিখেছে: -বিসাম ফায়িক (খুবই নরম মনের মানুষ)।

আমি তার নিচে লিখলাম:

-বিসাম সোনাটা আসলেই ভাল। খুবই ভদ্র আর সাহসী। আমি মনে করি সে একদিন অনেক বড় হবে, বাইতুল মাকদিস রক্ষার জন্য জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে।

এভাবে বছর শেষ হতো। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে, স্কুল ছুটির দিন একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মতো আয়োজন করে, আমি তাদের মাঝে খাতাগুলো বিতরণ করে দিতাম। প্রথম প্রথম তারা এটাকে অতটা গুরুত্বের সাথে নেয়নি। পরে যখন তারা এটার মজা বুঝে গেল, তারা সারা বছর চাতকের মতো খাতা দেয়ার দিনটির অপেক্ষায় বসে থাকতো।

খাতা দেয়ার পর সবার সে কি হুড়োহুড়ি! নিজের সম্পর্কে কে কী লিখেছে, তার সাথে আমি কী লিখেছি এসব দেখার সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তো।

অষ্টম শ্রেণীর শেষের দিকে আমি ইসরাঈলি বোমার আঘাতে আহত হয়ে মিসরে চলে এলাম। আর ফিরতে পারলাম না। মোসাদের লোকেরা আমার স্বামীকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। এমতাবস্থায় গাযায় ফিরে আসা আমাদের জন্য চরম বিপদজনক ছিলো।

অনেক দিন পর গাযায় ফেরার সুযোগ পেলাম। এতদিন আমার ছাত্রদের সাথে কোনও যোগাযোগ ছিল না। চেষ্টা করলে হয়তো সেটা সম্ভব ছিলো। কিন্তু দূর থেকে আর মায়া বাড়াতে চাইনি।

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, খবর এল, সদ্য শহীদ হওয়া এক যুবকের বৃদ্ধা মা আমাকে দেখতে চেয়েছেন। আমি গেলে তিনি খুবই খুশি হবেন। আমি প্রস্তুত হয়ে বের হলাম।

শহীদের বাড়িতে পৌঁছে আমি অবাক হলাম। আমি গাড়ি থেকে নামতেই একদল মানুষ আমাকে ঘিরে ধরলো। বোরখাপড়া মেয়েগুলো পারলে আমাকে কোলেই উঠিয়ে নেয়। সবার চেহারা দেখেমাত্র আমি মুহূর্তেই চিনে ফেললাম:

-এরা তো আমার কলিজার টুকরো ছাত্র-ছাত্রীরা। ইশ! কতদিন পর দেখা হলো। ওরাই আমাকে কাঁদতে কাঁদতে জানাল বিসাম ফায়িক গতকাল বিমান হামলায় শহীদ হয়ে গেছে। সে ডাক্তার হয়েছিলো। একটি আহত শিশুকে রাস্তার ওপর থেকে টেনে হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় বোমার আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

ওদের সাথে বিসামের মায়ের কাছে গেলাম। বৃদ্ধা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এই একটা মাত্র ছেলেই ছিলো তাঁর 'অন্ধের যষ্ঠি'। বিসামের আব্বুও তিন বছর আগে ইসরাঈলি কারাগারে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন। এই বৃদ্ধা মাকে দেখে কারো চোখেই অশ্রু বাঁধ মানছিলো না। বয়েসের কারণে তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিই ঝাপসা হয়ে এসেছিলো।

কথা হয়েছিলো, এবারের হামলাটা বন্ধ হলেই চোখের ছানিটা কাটিয়ে ফেলা হবে। বৃদ্ধা মা ঝাপসা দৃষ্টিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেকক্ষণ বুকে চেপে ধরে থাকলেন। পাশে বসিয়ে যা বললেন, তা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন:

-এই যে দেখুন, বিসামের ডায়েরি।

-আমি দেখলাম, ডায়েরিটাতে আলাদা কোনও লেখা নেই। সেই স্কুলে যে প্রশংসসূচক উক্তিগুলো তাদেরকে লিখে দিয়েছিলাম, সেগুলো খুবই সুন্দর করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় সাজিয়ে রাখা আছে। প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই ক্লাসমেট ও আমার উক্তির পাশাপাশি সে নিজেও একটা করে উক্তি লিখে রেখেছে।

আমি পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে শেষ পৃষ্ঠায় চলে এলাম। সেখানে লেখা আছে:

-বিসাম তুমি এত দুষ্টুমি করেও লেখাপড়া ও সবক্ষেত্রে এভাবে ভাল কর কিভাবে? (নুমাইসা)

আমার আদরের খোকা বিসাম কি জানে তাকে আমি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি? (লুবাইনা)

মা-মণি! আপনি কি জানেন, আপনার এবং বন্ধুদের ভালোবাসা আমার পুরো জীবনের জন্য অনুপম প্রেরণা হয়ে থেকেছে? আব্বুর শাহাদাতের পর তো আপনি ছিলেন না, বন্ধুরাও যে যার মতো আলাদা-আলাদা প্রতিষ্ঠানে লেখ-পড়ারত ছিলো। আশেপাশে কেউ এমন ছিলো না, যে আমার ভেঙে পড়া মনটাকে সান্ত্বনা যোগাবে। আমাকে দু'টা আশার কথা শোনাবে। তখন আপনার আর বন্ধুদের ছোট্ট ছোট্ট 'ভালোবাসাগুলো' আমার জন্য সঞ্জীবনী হিসেবে কাজ করেছে। (বিসাম ফায়িক)

জীবন জাগার গল্প : ৩৫৯

নামাযের পদ্ধতি

গভর্নর সংবাদ পেলেন শহরে একজন যুবক বয়েসী বুযুর্গ এসেছেন। সবাই দলে দলে তার কাছে গিয়ে নসীহত শুনছে। সবার নাকি বেশ উপকারও হচ্ছে।

গভর্নর একদিন রাতের বেলা গা ঢাকা দিয়ে, কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গসহ বুযুর্গের দরবারে এলেন। আগন্তুককে যাচাই করে দেখা। বুজরুকি না আসলেই কিছু আছে। প্রশ্ন করলেন:

-হযরত আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু বলুন তো!

-আপনি কি আমার কাছে নামাযের আদব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, নাকি নামাযের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন?

গভর্নর অবাক হলেন। মনে মনে বললেন:

-আমি প্রশ্ন করলাম একটা। উনি দেখি এক প্রশ্নকে দুইটা বানিয়ে ফেললেন!

-আচ্ছা, আমাকে প্রথমে নামাযের আদব সম্পর্কেই বলুন।

-এক: সকালে আল্লাহর আদেশে ঘুম থেকে জাগবেন। মসজিদে হেঁটে যাবেন সওয়াবের আশা করে। মসজিদে প্রবেশ করবেন নিয়ত করে। নামাযের তাকবীর বলবেন তা'যীমের সাথে। কিরাত পড়বেন তারতীলের সাথে। রুকু করবেন খুশুর (বিনয়) সাথে। সিজদা করবেন খুযুর (নম্রতা) সাথে। তাশাহহুদ পড়বেন ইখলাসের সাথে। সালাম ফেরাবেন প্রশান্তির সাথে।

-এবার তাহলে নামাযের অবস্থা সম্পর্কে একটু বলুন তো!

-কাবাকে আপনার দুই ভ্রুর মাঝে রাখবেন। মিযানকে দৃষ্টির সামনে রাখবেন। পুলসিরাতকে আপনার পায়ের নিচে রাখবেন। জান্নাতকে ডানে রাখবেন। জাহান্নামকে বামে রাখবেন। মালাকুল মাওতকে পেছনে রাখবেন। এত কিছুর পরও মনে সংশয় রাখবেন, নামায কবুল হবে নাকি হবে না।

-আপনি কতদিন যাবত এমন করে নামায পড়ে আসছেন?

-বিশ বছর যাবত।

গভর্নর সঙ্গীদের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললেন:

-চলো চলো! বিগত পঞ্চাশ বছরের নামায কাযা করি গিয়ে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬০

নার্সের বিস্ময়।

ফুয়াদ আল খাইয়াত। আশি বছরের এক বৃদ্ধ। একটা নার্সিং হোমে শুয়ে আছেন। বয়েসের ভাবে ন্যুব্জ। তবে কথাবার্তা, চলাফেরা এখনো টনটনে আছে। গত সপ্তাহে সামালি বাজারে যাওয়ার সময়, বেকায়দায় গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছেন।

সামালি একটা ছোট্ট শহর। ইয়েমেনের দক্ষিণে। এই শহরেই ফুয়াদ আল খাইয়াত দর্জির কাজ করে। আশেপাশের দশগ্রামের লোক তাকে চেনে। গ্রাম তো নয়, ছোট ছোট বসতি।

দর্জির এত বয়েস হয়েছে। এখনো নিজে নিজেই চলাফেরা করতে পারেন। দর্জির কোনও ছেলেমেয়ে নেই। বুড়িও মারা গেছেন অনেক আগে। সন্তান না থাকলেও ফুয়াদ আল খাইয়াতের মনে কোনও দুঃখ নেই। খেদ নেই।

আজ ছয়দিন হলো নার্সিং হোমে আছেন। নার্স রুবাইয়া সাম্মাহ অবাক হয়ে লক্ষ করছে, এ কয়দিনে বুড়ো রুগিটার কাছে, কম করে হলেও কয়েকশ লোক এসেছে। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে আসছে। হাসপাতালের কেবিনে জিনিসপত্র রাখার আর জায়গা নেই। শেষে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ কড়া নির্দেশ দিলো, বুড়োর জন্য কিছু নিয়ে এলে হাসপাতালের গুদামে জমা করতে হবে। আর দর্শনার্থীও বেশি আসতে পারবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! দিনদিন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চললো। একজনের জন্য আনা উপহার সমগ্রী দিয়ে পুরো হাসপাতালের নাস্তাপানির ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

ফুয়াদ আল খাইয়াতও মুক্তহস্তে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। দশদিনের মাথায় তার হাতের অবস্থা ভালো হয়ে গেলা। বিদায় নিয়ে আসার আগে রুবাইয়া বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলো:

-দাদু! তোমার এত ছেয়েমেয়ে কিভাবে হলো?

-আমার ছেলেমেয়ে কোথায় দেখলে হে!

-এই যে গত দেড় সপ্তাহ ধরে যারা গাদা গাদা উপহার নিয়ে তোমাকে দেখতে এল?

-ওরে বেটি! ওরা কেউ আমার ছেলেমেয়ে নয় রে।

-তাহলে ওরা কারা?

-ওরা সবাই আমার পাড়া প্রতিবেশী।

-পাড়া প্রতিবেশী হয়েও আপনার জন্য এত টান? কিভাবে এটা হলো?

-কিভাবে হলো তা আমি জানি না। তবে সারাজীবনই দেখে এসেছি, আমাকে আশেপাশের সবাই খুবই আপন ভেবে এসেছে। আমার ছেলেসন্তান না থাকার কোনও অভাব বুঝতে দেয় নি। আমাকে সব সময় গ্রামের যুবকরা সঙ্গ দিয়েছে। আর তোমার দাদুকে গ্রামের মেয়ে-বৌরা সঙ্গ দিয়েছে।

-নিশ্চয় আপনার এমন কোনও আমল আছে, যার ফলাফলস্বরূপ আল্লাহ আপনাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। আছে দাদু! এমন কিছু?

-কি জানি! এমন বিশেষ কিছু তো মনে পড়ছে না। একটা আমল হয়তো হতে পারে।

-আচ্ছা কী সেটা?

-আমি নিয়মিত তাবলীগে যাই। আমাদের জামাত বিভিন্ন মসজিদে যায়। সেখানে দু'তিনদিন থাকে, পরে আরেক মসজিদে যায়।

-জ্বি জানি। আমার দাদুও তাবলীগ করেন। তো তাবলীগের কারণেই কি এটা হয়েছে বলে মনে করেন?

-রাখ, বলছি, প্রতিবারই যখন আমাদের জামাত একটা মসজিদে যায়, অমি মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমেই একটা কাজ করি। মসজিদের তাকে রাখা কুরআন কারীমগুলোতে ধূলোময়লা জমে থাকে। আমি সেগুলো ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করি। এরপর অবহেলাভরে যেসব কুরআন কারীম রেখে দেয়া হয়েছে, আমি সেগুলো জমা করে বাড়ি নিয়ে আসি।

প্রতিদিন সকালে ও রাতে কাজ থেকে ফিরে, সেই কুরআন শরীফগুলোর প্রত্যেকটা থেকেই কমপক্ষে একটা আয়াত হলেও দেখে দেখে পড়ি।

-আর কিছু করেন দাদু?

-আরেকটা কথাও বলা যায়। বিয়ের পর প্রথম প্রথম যখন আমাদের সন্তান হচ্ছিল না, আমরা দু'জন নিয়মিত একটা দু'আ পড়তাম।

= হে আমার রব! আমাকে একা ছেড়ে দেবেন না। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬১

পিতার ক্ষমাপ্রার্থনা

হায়দারাবাদের মুসলিম অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। মালিহাবাদ। বিখ্যাত উর্দু কবি রিওয়াক মালিহাবাদির জন্মস্থান। এখানের একটি স্কুল। আযাদ স্কুল। স্কুলের একটা নিয়ম হলো:

-বছরে একবার অভিভাবকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দুইদিনব্যাপী একটা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। একেকবার একেক বিষয়ে কর্মশালা হয়। এবারের বিষয় হচ্ছে 'সন্তান প্রতিপালন ও প্রতিবন্ধকতা'।

এবারের প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছেন, অধ্যাপক সালিম খাজা।

বিভাগীয় প্রধান সোশ্যাল সায়েন্স। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিন:

অধ্যাপক সালিম খাজা তার আলোচনায় তুলে ধরলেন, কিভাবে একটি শিশুকে প্রতিপালন করতে হবে। কিভাবে একটি কিশোরের প্রতিপালন করতে হবে। কিভাবে বয়ঃসন্ধিতে পা দেয়া সন্তানের সাথে কথা বলতে হবে।

তিনি বক্তব্যের সময় লক্ষ করেছিলেন, বয়ঃসন্ধিতে থাকা সন্তানের সাথে পিতার আচরণ কেমন হবে, এ নিয়ে যখন আলোচনা করছিলেন, তখন সামনের সারিতে বসা একজন পিতার চেহারা বদলে যাচ্ছিলো। তার দু'চোখ থেকে পানি ঝরছিলো।

প্রথম পর্ব শেষে অধ্যাপক সালিম বিশ্রামকক্ষে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর এক ভদ্রলোক এসে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলো।

-জ্বি আসুন। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?

-আমি আপনার আলোচনা শুনেছি। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আপনার আলোচনা শুনে আমার দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরেছিলো।

-আপনার ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবেন?

-জ্বি, বলছি। আমার একটি সতের বছরের ছেলে আছে। গত পাঁচ বছর ধরে তার সাথে আমার কথা নেই। সে বয়ঃসন্ধিতে পা দেয়ার পর থেকেই বখে যেতে শুরু করেছিলো। পাড়ার খারাপ ছেলেদের সাথে তার যত আড্ডা ছিলো। ওঠাবসা ছিলো। সিগারেট ফুঁকতে শুরু করেছিলো। নানা রকমের

চরিত্রদোষে দুষ্ট ছিলো। মায়ের সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করতো। ছোট ভাইবোনদের সাথেও তার সম্পর্ক খারাপ ছিলো। বারবার বলার পরও সে নামায পড়তে চাইতো না।

শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমি তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। এখন সে তার নিঃসন্তান খালার বাসায় থাকে। গত পাঁচ বছর ধরে তার সাথে আমার মুখ দেখাদেখি নেই। স্যার আপনি কি বলেন? তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা অবস্থাতেই তো থাকা উচিত?

-আমি মনে করি, সম্পর্কটা জোড়া লাগিয়ে নেয়া।

-কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। গত পাঁচ বছরই যার সাথে আমার দেখা নেই। কথা নেই। তার সাথে আমার মিলন হবে কিভাবে?

- আসলে অপরাধ শুধু যে ছেলের তা কিন্তু নয়। সমান অপরাধ আপনিও করেছেন।

-আমার কি অপরাধ?

-আপনার অপরাধ হলো, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর তার অপরাধ হলো বাবার কথা না মেনে চলা। এখন খুবই ছোট্ট একটা কাজ করলেই সমস্যাটা মুহূর্তেই চুকে যাবে।

-কী কাজ?

-আপনি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন।

-বলছেন কি আপনি! পিতা হয়ে সন্তানের কাছে ক্ষমা চাইবো?

-হ্যাঁ, চাইবেন! সমস্যা কোথায়?

-আমি বাপু, এটা করতে পারবো না।

-ভাই! ভুল বা অপরাধ তো ছোটবড় চেনে না। যে ভুল করবে সে ক্ষমা চাইবে, এটাই তো জানা কথা।

অধ্যাপক সালিমের কথা সেই পিতার পছন্দ হলো না। চুপচাপ চলে গেলো।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন:

প্রশিক্ষণ আরম্ভ হলো। খাজা সালিম বলেন, বৃদ্ধটি গতকালের মতো প্রথম সারিতেই বসে আছেন। চেহারায় কেমন যেন অন্যরকম একটা আভা। আমি কৌতূহলী হয়ে আলোচনা বন্ধ করে, তার কাছে জানতে চাইলাম:

-কি ব্যাপার! আপনাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে?

-আমি আপনার পরামর্শ মেনেছি।

-কিভাবে?

-গত রাত দশটায় আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। তার দরজায় টোকা দেয়ার পর সে দরজা খুলে দিলো।

-তারপর?

-আমি তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, আমি তোমাকে পাঁচ বছর ধরে দূরে সরিয়ে রেখে ভুল করেছি। এমনটা আর হবে না।

সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেই আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে বললো:

-আব্বু! আমি আর কখনো আপনার অবাধ্য হবো না। আপনি যা বলবেন, মন দিয়ে শুনবো।

উপস্থিত অভিভাবকরা সবাই এই ঘটনা শুনে আপ্লুত হয়ে পড়লো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬২

কাঠুরিয়ার সততা

এক যুবকের পেছনে শত্রু লাগলো। যুবক একটুর জন্য বেঁচে গেলো। দৌড়ে বনের দিকে গেলো। শত্রুটাও পিছু পিছু অস্ত্র হাতে ছুটলো।

যুবকটা বনের ভেতরে গিয়ে দেখলো একলোক কাঠ কাটছে। তার সামনে এক বিরাট কাঠের স্তুপ পড়ে আছে। লোকটাকে বললো:

-আমাকে বাঁচান ভাই! আমাকে বাঁচান। আমার পেছনে শত্রু লেগেছে। ধরতে পারলে মেরে ফেলবে।

কাঠুরিয়া বললো:

-তুমি এই কাঠের স্তুপের ভেতের লুকিয়ে পড়ো।

যুবকটা তাই করলে।

কিছুক্ষণ গুণ্ডা লোকটা অস্ত্র উঁচিয়ে দৌড়ে এলো। কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলো:

-একটু আগে যে লোকটা এদিক দিয়ে গেলো, কোথায় সে, বলতে পারো?

-জ্বি।

-কোথায় সে?

-এই যে কাঠের স্তুপে লুকিয়ে আছে।

ডাকাত গুণ্ডাটা বললো:

-মিয়া! মিথ্যা বলার আর জায়গা পাওনা না? এই নাকের ডগায় লুকোবে নাকি?

এ কথা বলেই গুণ্ডাটা বনের দিকে চলে গেলো।

এবার যুবক আত্মগোপন থেকে বের হয়ে এলো। কাঠুরিয়াকে রাগতস্বরে বললো,

-আপনি, কোথায় লুকিয়েছি সেটা বলে দিলেন কেন? আপনি মিথ্যা করে অন্য কোন দিকেও দেখিয়ে দিতে পারতেন?

-তুমি যাই বলো, সত্য কিন্তু সবসময়ই মুক্তি দেয়।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬৩

আট আর তিন

একজন আলিমকে প্রশ্ন করা হলো:

-হুযুর! বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা এহেন ন্যক্কারজনক কখন থেকে হলো?

হুযুর উত্তর দিলেন:

-যখন থেকে আমরা আটটা বস্তুকে তিনটা বস্তুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছি, তখন থেকে।

-সেই তিনটা বস্তু আর আটটা বস্তু কি কি?

-আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(বলুন যদি

(১) তোমাদের পিতৃপুরুষগণ

(২) সন্তান-সন্ততি

(৩) ভাইয়েরা

(৪) স্ত্রীরা

(৫) জ্ঞাতিগোষ্ঠি

(৬) উপার্জিত সম্পদ

(৭) মন্দা হওয়ার ভয় করা ব্যবসা

(৮) পছন্দনীয় বাসস্থানসমূহ

অধিক প্রিয় হবে তোমাদের কাছে:

(১) আল্লাহ

(২) তার রাসূল

(৩) এবং তার রাস্তায় জিহাদ থেকে।

তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যদেরকে হিদায়াত দান করেন না (তাওবা:২৪)।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬৪

সবরের বরকত

মক্কায় এক লোক থাকতো। আবদুল্লাহ কুরাইশী। তার সংসারে শান্তি ছিলো না। লোকটা গরীবও ছিলো। এ নিয়ে সংসারে খিটিমিটি লেগেই আছে। স্ত্রী উঠতে-বসতেই খোঁটা দেয়। কথায় কথায় ঝামটা দিয়ে ওঠে। এই মুখরা স্ত্রীকে খুশি করার চেষ্টায় তিনি কোনও কমতি করেন নি। নানা আয়াস-প্রয়াস চালিয়েও সফল হলেন না।

এভাবেই কেটে গেলো জীবনের চল্লিশটা বছর। লোকটা সবর করেই কাটিয়ে দিলেন। যত বয়স বাড়ছে ততই বিবির মুখের ঝাল বেড়েই চলছে। শেষে লোকটা আর ধৈর্য ধরতে না পেরে, ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে মরুভূমিতে চলে গেলেন।

একটা জায়গায় তিনি দেখলেন, দুইজন দরবেশ ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। আস্তে করে তাদের সাথে বসে গেলেন। দুজনের দেখাদেখি তিনিও কুরআন তিলাওয়াত, নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন।

আরবদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মেহমান এলে, তিনদিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে না, আপনি কোত্থেকে এসেছেন। কোথায় যাবেন। কয়দিন থাকবেন, ইত্যাদি।

প্রথমদিন রাতের খাবরের সময় হলে একজন বুযুর্গ অপরজনকে বললেন:

-আজ আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের রাতের খাবার পাঠিয়ে দেন। তিনি দু'আ করলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরই দরজায় টোকা পড়লো। একজন লোক চমৎকার সব খাবার হাদিয়া দিয়ে গেলো।

এভাবে পরদিন অপর বুযুর্গ দু'আ করলেন। আজও সুস্বাদু সব খাবার দিয়ে গেলো, অজানা এক আগন্তুক।

তৃতীয় দিন দুই বুযুর্গ আবদুল্লাহ কুরাইশীকে বললেন:

-আজ আপনি দু'আ করুন। আল্লাহ যেন আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেন।

আবদুল্লাহ কুরাইশী মনে মনে ভাবলেন, আমি তো একজন গুনাহগার বান্দা। পাপের সাগরে ডুবে আছি। আমি দু'আ করলে কি রাব্বে কারীম, এই পাপীর কথায় সাড়া দিবেন?

তিনি দ্বিধা নিয়ে, ভয়ে ভয়ে, আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে, হাত তুললেন। বললেন:

-ইয়া আল্লাহ! আমার সাথে দুইজন আবিদ আছেন। তাদের ঈমান, তাদের নেক আমলের উসীলায় আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে দিন।

কিছুক্ষণ পরেই দরজায় টোকা পড়লো। এক ব্যক্তি দুই ব্যাগ খাবার নিয়ে উপস্থিত। দুই বুযুর্গ অবাক হলেন। প্রতিদিন এক ব্যাগ খাবার আসে, আজ দুই ব্যাগ এলো? তারা জানতে চাইলেন:

-আপনি ভাই কী দু'আ করেছেন? আল্লাহ অন্যদিনের চেয়ে বেশি খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন?

আবদুল্লাহ কুরাইশী বললেন:

-আমি তো আপনাদের তাকওয়া ও যুহদের উসীলা দিয়ে দু'আ করেছি। অন্য কিছু নয়।

আবদুল্লাহ কুরাইশী দুই বুযুর্গকে প্রশ্ন করলেন:

-আপনারা কিভাবে দু'আ করেছেন?

-আমরা শুনেছি, মক্কায় একজন লোক থাকেন। নাম তার আবদুল্লাহ কুরাইশী। আজ অনেক বছর যাবত তিনি স্ত্রীর দুর্ব্ব্যহারকে সহ্য করে আসছেন। এজন্য কখনো পাল্টা দুর্ব্যবহার করেন নি। সবর করেছেন। আমরা তার সেই সবরের উসীলা দিয়ে দু'আ করেছি।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬৫

সাদাকার ছায়া

শায়খ উসাইমীন (রহ.) বলেছেন:

এক লোকের স্ত্রী ছিলো খুকই দানশীলা। পরহেযগার। গরীব-দুঃখীদের প্রতি সমব্যথী। কিন্তু স্বামীটা ছিলো হাড়কেপ্পন। কঞ্জুস। হাত গলে এক ফোঁটা পানিও বের হতো না।

স্বামী সব সময় স্ত্রীকে, দান-খয়রাত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতো।

একদিন স্বামী মসজিদে গেলো। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। স্ত্রী দরজার কাছে গিয়ে ভেতর থেকে বললো:

-কে?

-আম্মাজান, আমি একজন অসহায়। ঠাণ্ডায় খুবই কষ্ট পাচ্ছি। আমার কাছে শীত নিবারণের মত কোনও কাপড় নেই।

স্ত্রীর মনটা গলে গেলো। স্বামীর নিষেধের কথা ভুলে গেলো। ভিক্ষুকটিকে তিনটা পুরনো কাপড় দিলো। সাথে খাওয়ার জন্য তিনটা খেজুরও দিয়ে দিলো।

স্বামী নামায পড়ে মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলো। স্বপ্নে দেখলো:

কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। মানুষজন বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। মাথার ওপর তীব্র গরম। সূর্যটা একদম মাথার ওপর থেকে আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে।

হঠাৎ লোকটা অবাক হয়ে দেখলো, তিনটা কাপড় এসে তার মাথার ওপর স্থির হলো। কিন্তু কাপড়গুলোতে তিনটা ছিদ্র ছিলো। কোত্থেকে যেন তিনটা খেজুর এসে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলো। এখন আর মাথার ওপর কোনও রোদ নেই।

লোকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বাড়ি এসে স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা খুলে বললো।

স্ত্রী বুঝতে পারলো, এটা তার দান করা তিনটা কাপড় আর খেজুরের বরকতে হয়েছে। স্বামীকে পুরো বিষয়টা খুলে বললো। স্বামী প্রত্যুত্তরে বললো:

-আজ থেকে একজন মিসকীনও যাতে আমাদের দরজা থেকে খালি হাতে না যায়।

(এই লোককে আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় একটা হাদীসের মূলবাণীই ফুটে উঠেছে: "কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষ তার সাদকার ছায়াতেই থাকবে" আহমাদ)।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬৬

তিনটি পছন্দের বস্তু

রাসূল (সা.) প্রশ্ন করলেন:

-আবু বকর তুমি কী পছন্দ করো?

-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পছন্দ হলো তিনটা বস্তু।

-আচ্ছা! কী সেগুলো?

=আমি ভালোবাসি আমার সব ধন-সম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করতে।

=ভালোবাসি, আপনার কাছে বসে থাকতে।

=ভালোবাসি, আপনার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে।

-আর উমর তুমি?

= ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও তিনটা বস্তু ভালোবাসি।

=আমি ভালোবাসি 'হককে'। ভালোবাসি হক কথা বলাকে। ভালোবাসি, অসৎ কাজে বাধাদানকে।

-আর উসমান তুমি?

=ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমিও তিনটা বস্তু ভালোবাসি।

= ভালোবাসি আমি, অন্যকে আহার দান করতে।

ভালোবাসি সালামের প্রসার করতে।

আরো ভালোবাসি লোকেরা ঘুমিয়ে গেলে রাত জেগে নামায পড়তে।

-আর আলী! তোমার?

=আমার ভালোবাসা অতিথির ইকরাম করার প্রতি।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে রোজা রাখার প্রতি।

আর তরবারি চালিয়ে ইসলামের শত্রু হত্যার প্রতি।

-এইবার আবু যর! তোমার কথা বলো।

=আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ! ভালোবাসি কয়েকটা অদ্ভুত বিষয়কে।

-আচ্ছা! কী সেগুলো?

=আমি ভালোবাসি ক্ষুধাকে।

=ভালোবাসি রোগবালাইকে।

=ভালোবাসি মৃত্যুকে।

-কিন্তু কেউতো এগুলোকে ভালোবাসে না?

-ইয়া রাসূলুল্লাহ!

ক্ষুধার্ত হলে আমার কলবটা নরম হবে। অসুস্থ হলে গুনাহর বোঝা হালকা হবে। আর মারা গেলে, আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬৭

আত্মমর্যাদাবোধ

পরিপূর্ণ শরয়ি পর্দা করে এমন একজন মহিলা এলো, কাযির দরবারে।

-কাযি সাহেব! আমার স্বামীর কাছে আমার মোহরানার টাকা বাকি রয়ে গেছে। তিনি টাকাটা দিতে অস্বীকার করছেন।

-কত টাকা?

-পাঁচশত দীনার।

-তোমার কোনও সাক্ষী আছে?

মহিলা সাক্ষী হাযির করলো। কিন্তু দেখা গেলো সাক্ষীরা সবাই গাইরে মাহরাম। অর্থাৎ তাদের সবার সাথেই পর্দা করা ফরজ।

কাযি সাহেব হুকুম দিলেন, সাক্ষীরা যেন মহিলার চেহারা দেখে তার দাবির সত্যয়ন করে।

এহেন পরিস্থিতি দেখে, স্বামী বললো:

-কাযি সাহেব! আমার স্ত্রী যা দাবি করছে, তা আমি পরিশোধ করে দেবো। আপনি তাকে মুখের নেকাব সরাতে নিষেধ করুন।

স্ত্রী বললো:

-কাযি সাহেব! আমিও আমার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ আর মানবিকতা দেখে, প্রাপ্য মোহরানা মাফ করে দিলাম।

খৃস্টানের শেষকথা

মুহাম্মাদ আজওয়াল। একজন বিখ্যাত বক্তা। তিনি মিসরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে বয়ান করে বেড়ান। নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে তার বেশ নামডাক আছে। তিনি হুসাফি সিলসিলার লোক। মিসরে এখন সূফিবাদের চর্চা কমে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

তিনি একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত দান করেন। কখন যে কাকে কিভাবে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন কেউ বলতে পারে না। আমার পরিচিত দুই যুবক কায়রোতে পড়াশোনা করে। তারা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে বেশ ভালোভাবে জড়িত। তারা আমাকে একটা ঘটনা শুনিয়েছে। তারা বললো:

-আমরা বিকেলে গাশতে বের হয়েছি। সামনের দিক থেকে আসা মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছিলাম। দ্বীনের কথা শোনাচ্ছিলাম। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা হাসপাতালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমন সময় একটা এমবুল্যান্স এসে দাঁড়ালো। ওটা থেকে এক যুবক নেমে দৌড়ে হাসপাতালের দিকে গেল। আমার দু'জন ভেতরটা দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। ভেতরে একজন বৃদ্ধা মহিলা শুয়ে আছেন। দুই চোখ খোলা। ঠোঁটদু'টো ফাঁক হয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। পায়ের পাতাট মৃদু মৃদু কাঁপছে।

আমরা বুঝতে পারলাম মহিলার একদম শেষ অবস্থা উপস্থিত। একটু পরেই তার রুহ চলে যাবে। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বৃদ্ধার দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তাকে কালিমার তালকীন দিতে থাকলাম। জোরে জোরে কালিমা পড়তে থাকলাম।

আওয়াজ শুনে মহিলার চোখের পাতাদুটো পিটপিট করে উঠলো। কী যেন বলতে চাইলো। চেহারায় খানিকটা বিস্ময়ও ফুটে উঠলো বোধ হয়। আমরা আরো জোরে, আরও দ্রুত কালিমা পড়তে থাকলাম। মহিলা আচানক জোরে, স্পষ্ট উচ্চারণে কালিমা পড়লো। সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

আমার সাদা চাদরটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলাম। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে, কিছুক্ষণ আগে নেমে যাওয়া যুবকটা এল, একটা হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে।

ছেলে মাকে মৃত দেখে নির্বাক হয়ে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমরা দু'জন মন খারাপ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলেটার কান্নার গমক কমে এলে, কাছে গিয়ে বললাম:

-তোমাকে একটা সুসংবাদ দিতে চাই।

-এহেন মুহূর্তে কী সুসংবাদ দিবে?

-তোমার আম্মুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা এখানে এসে পৌছি। আমরা তাকে কালিমার তালকীন করতে শুরু করেছিলাম। আল হামদুলিল্লাহ তিনি খুবই স্পষ্ট করে, জোর আওয়াজে কালিমা তাইয়িবা পাঠ করেছেন।

আমাদের কথা শুনে যুবক আবারো মাকে জড়িয়ে ধরে, আগের চেয়েও বেশি জোরে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পর যুবকের কান্না থামলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম:

-তুমি তোমার মায়ের সংবাদে খুশি না হয়ে, কাঁদতে শুরু করে দিলে যেন? আমরা তো মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে সহযোগিতা করেছি। তিনি মুমিনা অবস্থাতেই মারা গেছেন।

-তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা আমার মাকে কাফির বানিয়ে মেরেছো। সে তো এতদিন সারাজীবন বিশ্বাসী হয়ে বেঁচে ছিলো। শেষ মুহূর্তে তোমাদের দুজনের কারসাজিতে, মা আমার কাফির হয়ে মারা গেল।

-আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বলো তো!

-আমার মা এবং আমি কিবতি। কপটিক খৃস্টান।

জীবন জাগার গল্প : ৩৬৯

মায়ের আবদার

বৃদ্ধাশ্রম থেকে ফোন এলো:

-হ্যালো, ডিক বলছেন?

-জ্বি বলুন।

-আমি মিলেনিয়াম ওল্ডহোম থেকে বলছি। আপনার মা আপনাকে শেষবারের মতো একবার দেখতে চান।

-ঠিক আছে। আমি আসছি।

ডিক গিয়ে দেখলো, মা একদম শেষ অবস্থায়। মুমূর্ষু। দু'একদিনও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। আস্তে আস্তে গিয়ে শিয়রের কাছে চেয়ার টেনে বসলো। জানতে চাইলো:

-মা আমাকে ডেকেছো?

-জ্বি। আমার একটা শেষ ইচ্ছা ছিলো।

-কী ইচ্ছা?

-এই বৃদ্ধাশ্রমটা তো গরীবদের জন্য। সেবাযত্নের মান এতটা ভালো নয়। কেবিনগুলো বাতি-পাখাও ঠিক থাকে না। আমার কেবিনেও কোনও পাখা নেই। আজ অনেক দিন হলো। গরমে খুবই কষ্ট লাগতো।

-কই তুমি তো কখনো বলো নি।

-ফোন করেছিলাম। অনেকবার। কেউ ফোন ধরে নি। একবার ধরেছিলো কেউ একজন। আমার গলার স্বর পেয়ে রিসিভার রেখে দিয়েছে। তুই এই কেবিনে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিতে পারবি?

-অবশ্যই পারবো। কিন্তু মা, আজ বিশ বছর ধরে এখানে আছো, কখনো তো কিছুই চাওনি? এখন কেন চাচ্ছো?

-আমি হিশেব করে দেখলাম, ক'দিন পরই তুই রিটায়ার্ড করবি। তুই বৃদ্ধ হলে তোকেও তো তোর সন্তানরা এখানেই এনে রাখবে। আমি না হয় কষ্ট করে গরম সহ্য করে থেকেছি। কিন্তু তুই তো গরম একদম সহ্য করতে পারিস না।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭০

স্বপ্নে দেখা প্রাসাদ

এক লোক স্বপ্ন দেখলো, সে মারা গেছে। মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে একজন ফেরেশতা উড়ে উড়ে আকাশে উঠে গেল। সে দেখলো অনেক সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা। প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি। এত কিছু দেখে লোকটার দু'চোখ ছানাবড়া। ফেরেশতার কাছে জানতে চাইলো:

-এতসব আলিশান অট্টালিকা কাদের জন্যে?

-যারা মৃত্যুর পর আকাশে উঠে আসবে তাদের জন্যে।

লোকটা তো বেজায় খুশি। যাক সেও এগুলো থেকে একটা মালিক হবে। ফেরেশতাকে বললো:

-কই আমার প্রাসদটা কোথায় দেখিয়ে দাও। আর কত উড়বো।

-ওই যে, ছোট্ট ঘরটা দেখা যাচ্ছে সেটা।

-এটা তো একটা কুঁড়েঘর। আমি এটাতে থাকবো না। এখানে এমন ভাঙ্গাঘর কে বানিয়েছে?

-আকাশে ঘরবাড়ি বানানোর কোনও উপকরণ নেই। দুনিয়া থেকে মানুষ যে সৎকর্ম পাঠায়, সেগুলোই এখানে এসে ঘরবাড়ি তৈরীর উপকরণ হয়ে যায়। তা থেকেই প্রাসাদ-অট্টালিকা নির্মিত হয়।

-তুমি যাই বলো, আমি বড় একটা প্রাসাদেই থাকবো।

-ঠিক আছে। যাও। এই বলে ফেরেশতা লোকটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিলেন। লোক ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে পিঠ ডলতে ডলতে চোখ খুলে দেখলো, সে খাটের নিচে পড়ে আছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭১

মৃত্যুপথযাত্রীর আক্ষেপ

বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ছেলেমেয়েরা চারপাশ ঘিরে বসে আছে। একজন এক ভাবে সেবা করার চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ পিতা কতক্ষণ পরপরই বলে উঠছেন:

-হায় যদি আরো বেশি হতো! হায় যদি আরো নতুন হতো! হায় যদি আরো পুরো হতো!

ছেলেরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠলো। বাবার এমন কী অতৃপ্তি থেকে গেলো? তারা ব্যাপারটা জানতে চাইলো। বাবা বললেন:

-আমাদের মহল্লায় একজন অন্ধ লোক ছিলো। আমি তাকে নিয়মিত হাত ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে যেতাম। এখন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মনে হলো, হায়! যদি মসজিদটা আরো দূরে হতো। তাহলে আরো বেশি হাঁটতে হতো। কদমও বেশি লাগতো। সওয়াবও বেশি হতো।

-লোকটার পায়ের মোজা ছিলো না। আমি তাকে প্রতিবছরই আমার পুরনো মোজাগুলো দিয়ে দিতাম। এখন মনে হচ্ছে, ইশ! আমি যদি পুরনো মোজার বদলে, নতুন মোজাটাই দিয়ে দিতাম, এখন সওয়াবের পরিমাণ আরো বেশি হতো।

-আমাদের বাড়িতে অনেক বড় বড় রুটি বানানো হতো। একটা রুটি খেলেই পেট ভরে যেতো। আমি প্রতিদিন অর্ধেকটা রুটি বৃদ্ধকে দিয়ে দিতাম। এখন মনে হচ্ছে, আহ! আমি যদি পুরো রুটিটাই প্রতিদিন দিয়ে দিতাম! তাহলে এখন আমার সওয়াবের পাল্লা আরও ভারী হতো!

জীবন জাগার গল্প : ৩৭২

ডালপুরি

আম্মু বারবার নিষেধ করার পরও যিয়াদ দুষ্টুমি বন্ধ করছিলো না। আম্মু তাকে কয়েকটা উত্তম মাধ্যম দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন:

-তোর মতো দুষ্ট ছেলের চেহারা আমি দেখতে চাই না। বের হয়ে যা।

যিয়াদ কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করলো, আর জীবনেও ঘরে ফিরবে না। এমন নিষ্ঠুর মা আর কারো আছে কিনা সন্দেহ!

যিয়াদ হাঁটতে হাঁটতে শহরের আরেক প্রান্তে চলে এল। দীর্ঘক্ষণ হাঁটার ফলে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে একটা যাত্রীছাউনির বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়লো। রাস্তার ওপাশেই একটা খাবারের দোকানের প্রতি তার চোখ পড়লো। একটু বসার পর যায়েদ পায়ে পায়ে দোকানটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাহির থেকে দোকানে সাজিয়ে রাখা মজাদার খাবারের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পকেট হাতড়ে দেখলো একটা ফুটো পয়সাও তার কাছে নেই।

তাকে এভাবে নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন লোক এগিয়ে এসে বললো:

-কী খোকা! অমন করে কী দেখছো? ডালপুরি খাবে?

-আমার কাছে টাকা নেই।

-টাকা নেই তো কী হয়েছে? চলো।

লোকটার কোমল আচরণ দেখে যিয়াদ মুগ্ধ হয়ে গেলো। কৃতজ্ঞচিত্তে পুরি খেতে শুরু করলো। লোকটা এবার যিয়াদের কাছে এটাওটা জানতে চাইলো। যিয়াদ জানালো, সে মায়ের সাথে রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। আর জীবনেও ঘরে ফিরে যাবে না। এমন নিষ্ঠুর মা কারো হতে পারে না। আপনার মতো দয়ালু মানুষ আমি আর দেখি নি। আপনি আমার মায়ের চেয়ে অনেক ভালো।

-আচ্ছা, বুঝলাম তোমার আম্মু তোমাকে মেরেছে। বকা দিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলেছে। কিন্তু এমনটা কি প্রতিদিনই করেন?

-জ্বি না। মাঝেমধ্যে করেন।

-কেন করেন?

-দুষ্টুমি করলে।

-তোমার আম্মু বেশিরভাগ সময় কি তোমাকে আদর করেন নাকি শাসন করেন?

-বেশির ভাগ সময়ই আদর করেন?

-আমি তোমাকে কয়বার পুরি খাইয়েছি?

-একবার।

-তুমি আমাকে চেনো না। আর তোমাকে একবার পুরি খাইয়েছি। তাতেই আমি তোমার মায়ের চেয়ে ভালো হয়ে গেলাম? অথচ তোমার আম্মু তোমাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছেন। জন্মের পর থেকে তোমার সেবাযত্ন করে আসছেন। আর তুমি সামান্য শাসনেই মায়ের বিরুদ্ধে বলা শুরু করলে? যাও যাও, বাড়ি যাও। মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৩

মরিয়া পিতা

সিয়াজুং একজন দিনমজুর। চিনের হুয়ান প্রদেশের অধিবাসী। সিয়াজুং এর একটাই ছেলে, তার নাম গোগো।

গোগো একটু বড় হলেই তার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়লো। গরীব বাবা এই রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে হিমশিম খেলো। জমিজমা, স্বর্ণালঙ্কার যা ছিলো সব বিক্রি করে দিলো। কিন্তু এই রাজরোগের চিকিৎসার জন্যে রাজকপাল দরকার।

দিনমজুর বাবার সেই সামর্থ্য কোথায়? টাকার অভাবে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেলো। অসহায় পিতা কোনও উপায়ান্তর না দেখে ভিক্ষা করতে বসে গেল। কিন্তু ছেলের চিকিৎসার জন্যে টাকা চাইতে গেলে মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। মনে করে ছেলের নাম করে নিজেই সব হাতিয়ে নিচ্ছে। এদিকে গোগোর অবস্থা দিনদিন অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

সিয়াজুং ভেবেচিন্তে এক অভিনব উপায় বের করলো। শহরের ব্যস্ত সড়কের পাশে সে একটা খুঁটি গেঁড়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশেই একটা কাগজে বড় বড় করে লিখে দিল:

-আমাকে যে যতো জোরে পারেন ঘুষি মারুন। বিনিময়ে দয়া করে, আমার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্যে দশ ইয়েন দান করুন।

সিয়াজুং এর প্রয়াস এবার সফল হলো। তার মরিয়া অবস্থাটা অনেক পথচারীর নজরে এল। তাদের টনক নড়ল। বিষয়টা ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট পলিটব্যুরোর হাইকমান্ড পর্যন্ত গড়াল।

গোগো এখন বেইজিং এর নামকরা ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৪

রবার্ট ডেভিলার গল্প

উস্তাদ নু'মান আলী খানের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন:

-তিন মাস আগে আমি পোর্ট ওয়ার্থ শহরের এক মসজিদে বক্তব্য দিতে গিয়েছিলাম। গত চার-পাঁচ বছর যাবত আমার এই শহরে যাওয়া হয় নি। আমার বক্তব্যের বিষয় ছিলো দু'আ। অনেক মানুষের উপস্থিতি ছিলো। বয়ানও আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো হয়েছিলো। বয়ান শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে এলাম। একজন মিসরীয় যুবক এগিয়ে এল। সে বললো:

-আল্লাহ তা'আলা আজ আমার দু'আ কবুল করেছেন।

-আপনার দু'আ কি ছিলো?

-আমি দু'আ করে আসছিলাম, রবার্ট ডেভিলার সাথে যেন নু'মান আলী খানের দেখা হয়।

-আপনিই কি রবার্ট ডেভিলা?

-না আমি রবার্ট ডেভিলা নই। আমি তার বন্ধু। আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করতে শুরু করেছেন।

যুবকটির কথা শুনে আমি খুব আগ্রহী হয়ে উঠলাম। জানতে পারলাম ফোর্ট ওয়ার্থ থেকে রবার্টের শহর চল্লিশ মিনিটের পথ। সে এক সময় কৃষি কাজ করতো। একটা জেনেটিক সমস্যার কারণে, তার গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে। সে এখন স্থায়ীভাবে একটা নার্সিং হোমে থাকে।

সেই নার্সিং হোমের বেশির ভাগ রুগিই নব্বই কিংবা একশ বছরের বৃদ্ধ। একমাত্র রবার্টই সেখানে ব্যতিক্রম। সে ছিলো ত্রিশ বছরের যুবক। গত দশ বছর ধরে এই নার্সিং হোমেই সে পড়ে আছে। তার পরিবার তার জন্যে

বিশেষ ধরনের ভয়েস কমান্ড কম্পিউটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। যেটা দিয়ে সে তার কণ্ঠ ব্যবহার করে, ইন্টারনেট ব্যবহার করে, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখতো।

রবার্টের রুমে প্রতি সপ্তাহে খৃস্টান পাদরীরা সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্যে আসতো। রবার্টের সবচেয়ে কাছের বন্ধুও ছিলো তার পাশের খাটে। বন্ধুটিও প্যারালাইজড ছিলো। তার একটা লিভারের প্রয়োজন ছিলো। দু'বন্ধু সব সব সময় স্রষ্টা, জীবন আরো নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতো। মত বিনিময় করতো। তারা খুবই ভালো বন্ধু ছিলো।

একদিন রবার্টের বন্ধু খবর পেলো, তার জন্যে একজন লিভার ডোনার পাওয়া গেছে। সে খুবই খুশি হয়ে উঠলো। সে রবার্টকে বললো:

-রবার্ট! আমি একজন ডোনার পেয়েছি। আমাকে এখন যেতে হবে। আমি তোমাকে খুবই মিস করবো। কিন্তু আমাকে যেতে হবে।

রবার্টের বন্ধু চলে গেল। সে আসলেই চলে গেল। অপারেশন টেবিলে, লিভার ট্রান্সপারেন্টের সময় সে মারা গেল। রবার্টের এই বন্ধুটি খৃস্টান ছিলো। তার গলায় একটা ক্রুশ ঝুলতো সব সময়। সে মারা যাওয়ার পর, তার বোন সেই ক্রুশটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রবার্টকে দিয়ে গেল। ক্রুশটা রবার্টের বিছানার পাশেই ঝুলতো। এটা ছিলো তার চলে যাওয়া বন্ধুর রেখে যাওয়া শেষ স্মৃতি।

রবার্ট খুবই সাধারণ ও সাধাসিদে জীবন-যাপন করতো। তার জীবনটা নার্সিং হোমেই কেটে যাচ্ছিলো। নার্সরাই তার দেখাশোনা করতো। এরমধ্যে একদিন রবার্ট স্বপ্নে একজন লোককে দেখলো। স্বপ্নে দেখা মানুষটা নিজের নাম 'মুহাম্মাদ' বলে পরিচয় দিল। স্বপ্নের মানুষটা আঙুল দিয়ে ক্রুশের দিকে ইশারা করে বললেন:

-আল্লাহ তার নবীদেরকে এজন্য পাঠান নি, যেন মানুষ তাদের পূজো করে। বরং আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে। আর ঈসা হচ্ছেন কেবলমাত্র একজন মানুষ, তিনি বাজারেও যেতেন। খাবারও খেতেন। স্বপ্নটা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

রবার্ট এতদিন শুধুমাত্র ঈসা (আ.) নামে একজনকে জানতো। এখন সে মুহাম্মাদ নামেরও একজনের নাম শুনলো। যে তাকে বলেছে:

-নবীদের কাজ হলো, তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন, নবীদের ইবাদত নয়।

এবার রবার্ট মুহাম্মাদকে খুঁজতে শুরু করলো। এভাবে সে ইসলামকে খুঁজে পেলো। সে ঈমান আনল। যেহেতু সে এখন একজন মুসলিম, তাই সে কুরআন সম্পর্কে জানতে চাইলো। সে ইন্টারনেটে খুঁজে খুঁজে কিছু চ্যাটরূমে গেল আর অনুরোধ করল:

-তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন আমাকে কুরআন শেখাও।

প্রায় সাথে সাথেই রবার্ট একজন মিসরীয়কে পেয়ে গেল, যে তাকে আরবি শেখাতে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে আরবি বর্ণমালা শিখল। এরপর কুরআন পড়তে শিখলো। এবং সে নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে শুয়ে কুরআনের দশটা সূরা মুখস্থ করলো। এই পর্যায়ে রবার্টের মনে হলো, আমি কুরআন পড়তে শিখলাম। নবী সম্পর্কে জানা শুরু করলাম। এখন আমাকে জানতে হবে, কুরআনের শিক্ষা আসলে কি? সে খুঁজতে লাগলো, কিভাবে কুরআন বোঝা যায়। কোনও একভাবে সে আমার (নু'মান আলী খান) লেকচারের ভিডিওগুলো পেলো। একে একে সবগুলো ভিডিও সে দেখে ফেললো।

রবার্টের নার্সিং হোমে একজন মিসরীয় লোক ছিলো, যে সেখানে টুকটাক কাজ করতো। তার নিজেরও একটা চমৎকার গল্প আছে। সে একজন মুসলিম কিন্তু খুব একটা ধর্ম মেনে চলতো না। তার সবচেয়ে কাছের মসজিদটা ছিলো পঞ্চাশ মাইল দূরে। এজন্যে সে কাছের চার্চে যেত যাতে আল্লাহকে পাওয়া যায়।

একদিন সে রবার্টের কেবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলো:

-ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুসরিন।

সে কেবিনে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো:

-রবার্ট তুমি কী শুনছো?

-কই কিছু না তো, আমিই পড়ছিলাম।

-তুমি কি তাহলে মুসলিম হয়েছো?

-হ্যাঁ, আমি মুসলিম হয়েছি।

মিসরীয় লোকটা ভীষণ অবাক হলো:

-কিভাবে আল্লাহ আমেরিকার চার্চের নগরীর মধ্যে একজনকে পথ দেখাতে পারেন? যার বেডের পাশে ক্রুশ ঝুলে থাকে। যে নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে থাকে। নড়াচড়ার কোন শক্তিই নেই।

সে নিজে নিজে বলে উঠলো:

-আমি আবার আল্লাহর কাছে ফেরত আসতে চাই।

রবার্ট তার এই নতুন মিসরীয় বন্ধুকে তার অনলাইন শিক্ষক নুমান আলী খানের কথা বলল। এবার সেও আমার ভিডিওগুলো দেখতে শুরু করলো। একদিন রবার্ট তার বন্ধুকে বললো::

-যদি নু'মান আলী খানের সাথে আমার দেখা হতো।

বন্ধুটি বললো:

-ঠিক আছে, তোমার জন্যে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করবো।

এই ঘটনার ঠিক পাঁচ বছর পরে, সেই মিসরী বন্ধুটি ফোর্ট ওয়ার্থের সেই মসজিদে নামায পড়তে এল। জুমার পর সে বললো:

-আল্লাহ আমার এবং আমার বন্ধুর দু'আ কবুল করতে যাচ্ছেন।

আমি বললাম:

-জ্বি, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

আমরা কয়েক জন মিলে রবার্টের কাছে গেলাম। তার সাথে কথা বললাম। আমাদের চমৎকার কিছু সময় কাটলো। বিদায় নিয়ে আসার সময় বলে এলাম::

- আগামী ঈদে আমরা আবার দেখা করার জন্যে আসবো। ইনশাআল্লাহ।

আমরা যখন নার্সিং হোমে গেলাম, নার্স আমাদেরকে দেখে খুবই অবাক হলো। জানতে চাইলো:

-আপনারা সবাই রবার্টকে দেখতে এসেছেন?

-হ্যাঁ।

-তার সাথে কেন দেখা করতে চান?

-কারণ সে আমাদের অনুপ্রেরণা।

এরপর নার্স নানা জায়গায় ফোন করলো। তারপর আমাদেরকে অনুমতি দিলো। রবার্ট আমাদেরকে দেখে চমকে উঠলো। রবার্টের সাথে কথা বললাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম:

-রবার্ট, শুনেছি আপনি কয়েকটা সূরা মুখস্থ করেছেন।

-জ্বি।

-আমাকে একটা সূরা শোনাতে পারেন?

রবার্ট আমাদেরকে সূরা আসর শোনালো। তার তিলাওয়াত শুনে আমাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলো না যে কাঁদে নি। প্রত্যেকের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছিলো।

আসলে যখন কেউ আল্লাহর দিকে আসতে চায়, তখন সাহায্য নিয়ে ভাবার দরকার নেই। সাহায্য আসবেই।

রবার্টের একটা বিশেষ হুইল চেয়ার ছিলো। চেয়ারটা তার ঘাড়ের নিচ থেকে পুরো শরীরকে আটকে রাখতো। কারণ শরীরের কোনও অংশের ওপর রবার্টের নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। আরেকটা বিশেষ ভ্যান ছিলো যেটা তার হুইল চেয়ারকে আটকে রাখতো। যাতেকরে তার শরীরে কোনও রকমের ঝাঁকুনি না লাগে। কারণ সে ঝাঁকুনি সে মোটেও সহ্য করতে পারতো না। একদিন সে অনুরোধ করলো সে জুমু'আর নামাযে যেতে চায়। সেদিন আবার তার বিশেষ ভ্যানটি ছিলো না। তাকে একটা সাধারণ ভ্যানে পাঠানো হলো। কিন্তু সাধারণ ভ্যানে চড়ে যাওয়ার কারণে তার শরীরে আঘাত লেগে গেল। জুমার নামায থেকে ফিরে এল প্রচণ্ড ব্যাথা নিয়ে। নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ জানালো:

-রবার্ট! দুঃখিত, তোমাকে আমরা হুইল চেয়ারটিতে বসতে দিতে পারবো না। তোমাকে পুরোপুরি বেডরেস্টে থাকতে হবে, অন্তত আগামী ছয়মাসের জন্যে। তারপর যদি ভালো হও তাহলে আমরা ভেবে দেখবো।

আমরা যখন তার সাথে দেখা করতে গেলাম, তখন তার বেডরেস্টে থাকার তিনমাস পার হয়ে গেছে। তার পিঠে ব্যথার কারণ ছিলো সে জুমু'আর নামাযে গিয়েছিলো। তারপরও সে আমাকে বললো:

-আমি জীবনেও মসজিদের চেয়ে, এত শান্তির কোনও জায়গায় যাইনি। আপনি জানেন এরপর আমি কী করবো? আমি আমার চেয়ারটা ফেরত পেলেই আবার নামাযে যাবো। কারণ মসজিদে যাওয়ার মতো সুখময় অনুভূতি আমি আর কোথাও পাই নি।

সে এমন একজন, যার চোখ আর মুখ ছাড়া আর কোনই শারীরিক ক্ষমতা নেই। তারপরও সে বলে:

-আমি একমাত্র মসজিদেই শান্তি পেয়েছি। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সেখানে যাবো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যে। শুধুই আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যে। আমি আর আল্লাহ। আল্লাহ আর আমি। কোনও মানুষের সাথে কথা বলার জন্যে নয়।

রবার্ট আরো বললো:

-মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, কেন আল্লাহ আমাকে এমন করে সৃষ্টি করলেন? পরক্ষণে আমি নিজেই নিজের ওপর হাসি। আল্লাহ আমাকে অনেক অনেক কিছু দিয়েছেন। আমি আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যদি আমাকে

ইসলামে আনার জন্যে এটাই হয় আল্লাহর পরিকল্পনা, তাহলে এটাই ঠিক আছে। আমার এটাও মনে হয়, আল্লাহ যদি আমার মতো মানুষকে পথ দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি সবাইকে পথ দেখাতে পারেন।

অনেক মুসলমানকে দেখা যায়, তারা অল্প একটু অসুখী হলেই বলে:

-কেন আল্লাহ আমার সাথে এমনটা করলেন?

আর মাঝে মাঝে এই লোকটাই বলে বসে:

-আল্লাহ বলতে আসলে কেউ নেই।

যদি একজন লোকেরও এ ধরনের কথা বলার অধিকার থাকতো, তাহলে সে হতো রবার্ট ডেভিলা। সেই বলতে পারতো:

-আমি আল্লাহয় বিশ্বাস করি না। যদি আল্লাহ থাকতেন, তাহলে আমার এই অবস্থা কেন?

এরপরও আমি রবার্টের চেহারায় যে নূর দেখেছি, আর কারও চেহারায় দেখিনি। আমি তার মতো সুখী মানুষও আর কাউকে দেখি নি। সে একজন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ। প্রচণ্ড সুখী। সত্যিই সে সুখী।

রবার্ট আমার শিক্ষক। আমি তাকে আমার শিক্ষক মনে করি। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে:

-আপনার শায়খ কে?

-আমি সাথে সাথে উত্তর দেই : রবার্ট ডেভিলা।

সবাই অবাক হয়ে বলে:

-সত্যি

-হ্যাঁ, সত্যি।

পথনির্দেশনা আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমাদের আসলে চিন্তা করা উচিত নয়, আমাদের কাছে কি কি জিনিস নেই। বরং ভাবতে হবে, কি কি নেয়ামত আমার মধ্যে আছে। আমরা তো সবাই জানি আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আসহাবে কাহাফকে রেখেছেন। ঘুমের মধ্যেও আল্লাহ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তাদেরকে এপাশ-ওপাশ করিয়েছেন। যখন সূর্য উঠেছে তাদেরকে একদিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যখন সূর্যাস্ত গিয়েছে তাদেরকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ঘুমের মধ্যেও আমাদেরকে সাহায্য করবেন, যদি আমরা চাইতে পারি। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমাদের সন্দিহান হওয়ার কিছু নেই। কিভাবে সাহায্য আসবে সেটা

আল্লাহর কাজ। আমাদের কাজ হচ্ছে 'তাঁর' সাথে কথা বলা। তাঁর সাথে যোগাযোগ করা। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার এটাই রাস্তা। আমরা আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারলে আল্লাহ আমাদের জন্যে তার দরজা খুলে দিবেন। তিনি আমাদেরকে বন্ধু দিবেন, শিক্ষক দিবেন। সাহায্য দিবেন। সব দিবেন। যেন আমরা আল্লাহর দিকে আরো অনেক অনেক বেশি করে এগিয়ে যেতে পারি। যেন আমাদের জীবনটা আরো সুন্দর হয়।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৫

উত্তরাধিকার

পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি চাইলেন চলে যাওয়ার আগেই সম্পত্তি সঠিকভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে যেতে। তার তিন ছেলে। তিনজনের নামই আবদুল্লাহ।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শুয়ে শুয়েই তিনি বললেন:

-আমার মৃত্যুর পর দুই আবদুল্লাহ সম্পত্তির ভাগ পাবে। আরেক অবদুল্লাহ পাবে না।

একথা বলার কিছুক্ষণ পরই পিতা মারা গেল। ছেলেরা পড়ল বিপাকে। কোন আবদুল্লাহ বাদ যাবে, তারা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না। সবাই মিলে ঠিক করলো কাযির কাছে যাবে। বিধবা মায়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তিন আবদুল্লাহ কাযির দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল।

গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাওয়ার পর এক বৃদ্ধ রাখালকে দেখল কী যেন খুঁজছে। তিন ভাই জানতে চাইলো:

-কী খুঁজছ গো?

-আমার হারিয়ে যাওয়া উটটা খুঁজছি। তোমরা কি দেখেছ আমার উটটাকে?

এক আবদুল্লাহ বললো:

-তোমার উটটার কি একচোখ কানা?

রাখাল খুশিতে লাফিয়ে উঠে বললো:

-হ্যাঁ হ্যাঁ।

আরেক আবদুল্লাহ বললো:

-তোমার উটটার লেজ কি কাটা?

-হ্যাঁ।

আরেক আবদুল্লাহ বললো:

-তোমার উটটা ল্যাংড়া ছিলো?

-হ্যাঁ। ভাইজানরা বলুন না, আমার উটটা কোথায় দেখেছেন? আমি বৃদ্ধ মানুষ। বড় পেরেশান আছি।

তিনভাই সমস্বরে বলে উঠলো:

-না না, আমরা তোমার উট দেখিনি।

রাখাল খেপে গিয়ে বললো:

-তোমরা আমার উট না দেখলে উটটা কেমন সেটা কিভাবে বললে? তোমরা আলবৎ দেখেছ। আমার উট কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো। না হলে আমি কাযির কাছে নালিশ করবো।

তিন ভাই বললো:

-আমরা তোমার উট দেখিনি। তুমি শুধু শুধুই আমাদেরকে সন্দেহ করছো। তোমার বিশ্বাস না হলে কাযির কাছে চলো। আমরা তো এমনিতেই কাযির দরবারে যাচ্ছি।

কাযি বৃদ্ধ রাখালের অভিযোগ শুনলেন। ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করলেন:

-তোমরা কি সত্যি সত্যিই উটটা দেখ নি?

-জ্বি না।

-না দেখে থাকলে তোমরা উটটার তিন বৈশিষ্ট্য ঠিক ঠিক বলে দিলে কিভাবে?

তিনভাই যার যার বক্তব্য তুলে ধরলো:

= আমি উটটার একচোখ কানা বলেছি, কারণ আসার সময় দেখেছি, রাস্তার পাশের ঘাসগুলো একদিক থেকে খাওয়া, আরেকদিকের ঘাসগুলো থেকে গেছে। এটা দেখে আমার ধারণা হলো, যে জন্তু এই ঘাস খেয়েছে সেটার একটা চোখ নেই। সেজন্য একদিকের ঘাস দেখলেও অন্য দিকের ঘাসগুলো তার চোখে পড়েনি। পড়লে তো সেগুলোও খেতো।

দ্বিতীয় ভাই বললো:

= আমি উটটার লেজকাটা কিনা জানতে চেয়েছিলাম। কারণ আমি দেখেছি রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বিষ্ঠাগুলো দলা দলা হয়ে পড়ে আছে। উটের বিষ্ঠাগুলো তো সাধরণত লেজের কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে, ভাগ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এসব দেখে আমার মনে হয়েছে উটটার লেজ নেই।

আরেক ভাই বললো:

= আমি আসার সময় রাস্তায় উটের পায়ের দাগ দেখে এসেছি। কিন্তু তিনটা পায়ের দাগ মাটির মধ্যে বেশ গভীর হয়ে আছে, একটা দাগ অগভীর। আমার ধারণা হয়েছে, প্রাণীটার একটা পা নুলো। সেজন্য পায়ের চাপটা দুর্বল হওয়ার কারণে ছাপটাও অগভীর হয়েছে।

তিন ভাইয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য শুনে কাযিসহ সবাই বেশ অবাক হলো। কাযি মুগ্ধ হয়ে রায় দিলেন:

-এই তিন ভাই সত্যিই উটটা দেখে নি।

কাযি এবার ভাইদের দিকে ফিরে বললেন:

-তোমাদের খবর বল:

তিনভাই তাদের সব কথা কাযির কাছে খুলে বললো। কাযি সব শুনে বললেন:

-তোমরা আজ রাতটা সরকারী মেহমানখানায় থাকো, তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা আগামীকাল দেবো।

কাযি তিন ভাইয়ের যথাযথ মেহমানদারি করার জন্য লোকদেরকে বলে দিলেন।

তিন ভাই মেহমানখানায় গিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিল। শোয়ার পরই এক ভাই বললো:

-এই সাবধান! কাযি কিন্তু আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছেন। সে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে।

কিছুক্ষণ পর খাবার নিয়ে এল। খাবার দেখেই একজন বললো:

-এই তোমরা কেউ খাবার ছুঁবে না বলছি। এগুলো কুকুরের গোশত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আরেক জন সাথে সাথেই বলে উঠলো:

-আমাদেরকে খেতে দেয়া রুটিগুলো যে মহিলা বানিয়েছে, সে নয় মাসের গর্ভবতী।

তৃতীয় ভাই বললো:

-আল্লাহর কসম! এই কাযিটা ভাল নয়, সে একটি জারজ সন্তান।

কাযির নিয়োগ করা গোয়েন্দা গিয়ে কাযিকে সব কথা খুলে বললো। পরদিন কাযি বিচারে বসলেন। তিন ভাইকে ডেকে পাঠানো হলো।

-তোমাদের বিরুদ্ধে তো মারাত্মক মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। আচ্ছা বলো তো, তুমি কুকুরের গোশত কিভাবে বললে?

-আমি গোশতগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। গোশতের টুকরাগুলোতে চর্বিগুলো হাড্ডির সাথে লেগে ছিল। চর্বির ওপরে ছিল গোশত। এটা সাধারণত কুকুরজাতীয় প্রাণীদের গোশতের মধ্যেই দেখা যায়। উট বা মেষজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে হাড্ডির সাথে গোশত লেগে থাকে, গোশতের উপর থাকে চর্বি। এই দেখেই আমি বলেছিলাম এটা কুকুরের গোশত।

কাযি মেহমানখানার বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন:

-ঘটনা কি সত্যি?

-হুযুর! আপনি বলেছিলেন মেহমানকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে। আমাদের পালিত গবাদি পশুগুলো তখনো চারণভূমি থেকে ফিরে আসেনি। তাই আমরা ভয়ে একটা কুকুরকে জবেহ করে রান্না করে, মেহমানকে খেতে দিয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম তারা গ্রামের মানুষ, ধরতে পারবে না।

কাযি আরেক ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন:

-তুমি কিভাবে নয় মাসের গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারটা বললে?

-আমি দেখেছি, রুটিগুলোর একদিকে ফুলে আছে, আরেক দিকে চুপসে আছে। আবার একদিকে বেলুনের দাগ সুন্দরভাবে ফুটে আছে, আরেক দিকে দাগটা নেই। আমার মনে হয়েছে, মানুষটা একদিকে ভর দিয়ে বসেছে, সেদিকেই রুটিটা সুন্দর হয়েছে। ফুলেছে। আরেক দিকে উদরস্ফীতির কারণে হাতটা পৌঁছে নি। রুটিটাও খুন্তি দিয়ে চাপ দিতে পারে নি। এমন অবস্থা শেষ পর্যায়ের গর্ভবতী মহিলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

কাযি খবর নিয়ে জানতে পারলেন আসলেও ঘটনা তাই। বাবুর্চির স্ত্রীই রুটিগুলো বানিয়েছে। তার স্ত্রী নয় মাসের গর্ভবতী।

কাযি এবার তৃতীয় ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন:

-তুমি কেন আমাকে অবৈধ সন্তান বললে?

-আমি চিন্তা করে দেখছি, যে লোক তার মেহমানদের পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে দিতে পারে, তাদেরকে কুকুরের গোশত খাওয়াতে পারে, সে কখনোই নেক সন্তান হতে পারে না। সে নিঃসন্দেহে............।

কাযি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে পর্দা সরিয়ে ঘরে গেলেন। মাকে জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন:

-লোকটা সত্য বলেছে।

কাযি ফিরে এসে বিচারের রায় ঘোষণা করলেন:

-যে ভাই আমাকে জারজ সন্তান বলেছে, সে সম্পত্তি পাবে না। বাকি দু'ভাই সম্পত্তি পাবে।

সবার অবাক দৃষ্টি দেখে কাযি বলে উঠলেন:

-আপনারা বুঝি ভেবেছেন আমি রাগ করে তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছি?

-জ্বি।

-না, ব্যাপারটা তা নয়। যে আমাকে জারজ সন্তান বলেছে, আসলে সে নিজেও একটা জারজ সন্তান, সেজন্য আমি তাকে সম্পত্তি না দিতে বলেছি।

-কিভাবে কথাটা বললেন?

-এটা তো সহজ। একজন জারজ সন্তানই আরেকজন জারজকে চিনতে পারে। যেমনটা সে আমাকে চিনতে পেরেছে, আমিও তাকে চিনতে ভুল করি নি।

ভাইয়েরা বিষয়টা যাচাই করার জন্যে গ্রামে ফিরে গেল। মায়ের কাছে জানতে চাইল। মা বললেন:

-হাঁ, কাযির কথা সত্যি। সে তোমাদের আপন ভাই নয়। তোমাদের আব্বু একদিন ফজর নামায পড়তে গিয়ে তাকে মসজিদের সামনে পড়ে থাকতে দেখে, উঠিয়ে এনেছিলেন।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৬

মদ্যপায়ী ইমাম

রাফাহ খালিদ আর ফুয়াদ হাইসাম দু'জনের মাঝে গলায় গলায় ভাব। বাড়ি মদীনা মুনাওয়ারায়। রাসুলের দেশের অধিবাসী হলেও, দু'জনেই বেড়ে উঠেছে লন্ডনে। সেখানেই পড়াশোনা।

পড়াশুনা শেষ করে আপাতত থাকতে এসেছে নিজেদের শহর মদীনায়। নবীজীর দেশের মানুষ হলেও নবীজীর আদর্শের সাথে তাদের পরিচয় সামান্যই।

বেড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের ভাবধারায়। শিক্ষা পেয়েছে ইউরোপীয় চিন্তাধারার। আরব হলেও ধর্মশিক্ষা বা ধর্মপালনে সম্পূর্ণ অনারব। একদম

ছেলেবেলা থেকেই গির্জা দ্বারা পরিচালিত স্কুলের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করাতে ইসলামের কিছুই শিখতে পারে নি। এমনকি কুরআন কারীমও মুখস্থ করা হয় নি।

দু'জনের পরিবারেই মদীনায় থাকতে শুরু করেছে। তারাও কিছুদিন পরিবারের সাথে থাকতে এসেছে। কিন্তু কয়েকদিন মদীনায় থেকেই তারা হাঁফিয়ে উঠলো। তাদের অনেক কিছুর নেশা ছিলো, যা তারা মদীনায় থেকে পূরণ করতে পারছিলো না।

দু'জন মিলে ঠিক করলো কোথাও বেড়াতে যাবে। ভেবেচিন্তে তুরস্কের ইস্তাম্বুল যাওয়া স্থির হলো। ইস্তাম্বুল এসে দুজনের আর কোনও বাধা রইল না। তারা ঠিক করলো, এ কয়টা দিন মনের সুখে ঘুরে বেড়াবে আর যা ইচ্ছা তা করে বেড়াবে।

হোটেলের ম্যানেজার মদীনা থেকে এসেছে শুনে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভীষণ অবাক আর শ্রদ্ধামাখা আওয়াজে বললো:

-আপনার সত্যি সত্যিই নবীজির দেশ থেকে এসেছেন? যে শহরে নবীজির রওজা মুবারক সে শহর থেকে এসেছেন?

দু'বন্ধু ম্যানেজারের বিস্ময় আর শ্রদ্ধা দেখানোর বহর দেখে অবাক হলো। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনেই, সাথে করে নিয়ে আসা বোতল থেকে, ইচ্ছা মতো মদপান করলো। লন্ডনে থাকতে প্রতি রাতেই বারে গিয়ে গলা ভেজাত। গত দু'সপ্তাহ মদীনায় থেকে, আত্মীয়-স্বজনদের চোখ এড়িয়ে সুবিধা করতে পারে নি। আজ তো আর কোন বাধা নেই।

রাত যতই গভীর হচ্ছিল, তারা ততই নেশায় চুরচুর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে খালিদ পুরোপুরি মাতাল হয়ে বেহুঁশের মতো ঘুমিয়ে পড়লো। ফুয়াদও পুরোপুরি মাতাল না হলেও প্রায় আধমাতালের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। শেষ রাতের দিকে দরজায় টোকা পড়লো। অনেকক্ষণ আওয়াজ করার পর ফুয়াদের ঘুম ভাঙলো। চোখ কচলাতে কচলাতে, হোঁচট খেতে খেতে উঠে কোনও রকমে দরজা খুলে দিল। দরজায় হোটেলের ম্যানেজার দাঁড়িয়ে আছে।

-এত রাতে?

-না, রাত কোথায়? এই তো ফজরের আযান হয়ে গেছে। আপনারা মদীনা থেকে এসেছেন শুনে, হোটেলের কর্মীরা সবাই আজ ফজরের নামায

পড়ার জন্যে উঠে গেছে। সবারই ইচ্ছা, আপনাদের ইমামতিতে নামায পড়বে। রাতে তো আপনাদেরকে অনেকেই দেখতে পায়নি। সবাই ভেবেছিলো আপনারা নিচে গিয়েই খাবার খাবেন। এজন্য রাতেও সবাই আপনাদেরকে দেখার জন্যে মুখিয়ে ছিলো।

আপনারা রুম সার্ভিসের মাধ্যমে খাবার রুমে নিয়ে আসাতে সবাই হতাশ হয়েছে। তাই আমি সবাইকে বলে দিয়েছিলাম:

-তারা দু'জন আমাদের সম্মানিত মেহমান। তাদের সাথে দেখা করতে হলে ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়তে হবে। তারা নামাযের ইমামতি করবেন।

ম্যানেজার চলে গেল। ফুয়াদ অনেকবার সজোরে ধাক্কা দেয়ার পর খালিদ ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠলো। সব কথা শুনে খালিদ রীতিমতো আঁতকে উঠলো।

-এখন বাঁচার উপায়? শেষ কবে নামায পড়েছি, মনেও করতে পারছি না। আর কোনও সূরা মুখস্থ আছে কিনা তাও জানি না। ইমামতি কিভাবে করবো?

- কোনও উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পাকসাফ হয়ে নাও। লোক দেখানোর জন্যে হলেও তো নীচে যেতে হবে।

দু'জনের দেরি দেখে ম্যানেজার আবার এলেন। বললেন সূর্য উঠতে আর বেশি দেরি নেই। তাড়াতাড়ি আসুন। দু'জনে অগত্যা নীচে গেল। দু'জনে এক প্রকার বাধ্য হয়েই গেল। সবাই সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল। দু'জনের অদৃশ্য ঠেলাঠেলিতে ফুয়াদই হেরে গেল। মৃদু ধাক্কা দিয়ে তাকে সামনে পাঠিয়ে দিল খালিদ।

ফুয়াদ সূরা ইখলাস দিয়েই উভয় রাকাত শেষ করলো। নামায শেষে সবাই দু'জনকে ঘিরে ধরলো। নবীজীকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। নবীজীর রওযা মুবারক কেমন বারেবারে জানতে চাইলো।

হোটেল রুমে ফিরে এসে, দু'জনের মধ্যেই ভাবান্তর দেখা দিল, শুধু নবীজীর দেশের মানুষ হওয়াতেই এত সম্মান?

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৭

আপন আপন ভাবনা

জমজমাট রেস্তারাঁটা এখন, দিনের শেষে কিছুটা কমে এসেছে। খদ্দেরের খুব একটা ভীড়বাট্টা নেই। তারপরও দুয়েকটা আসন ছাড়া প্রায় সব আসনই ভর্তি। নানা বয়সী মানুষ যার যার চাহিদা মতো খাবার খাচ্ছে। এক দীর্ঘদেহী যুবক এল।

খুঁজেপেতে একদম কোণার এক খালি টেবিলে গিয়ে বসলো। কারো দিকে না তাকিয়েই পকেট থেকে কাগজ বের করে খসখস করে কী যেন লিখতে শুরু করে দিল।

রেস্তোরাঁয় বসে থাকা বিভিন্ন বয়েসী খদ্দের যুবকটার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকালো। কিন্তু সবার ভাবনা ছিলো ভিন্ন।

-এক বৃদ্ধা ভাবলো: সে মায়ের মাছে চিঠি লিখছে।

-যুবতী ভাবলো: বান্ধবীর কাছে চিঠি লিখছে।

-এক শিশু ভাবলো: ছবি আঁকছে।

-ব্যবসায়ী ভাবলো: নতুন ব্যবসার ছক কষছে।

-চাকুরিজীবী ভাবলো: নতুন পে স্কেলের হিশেব করছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৮

রক্তদান

ওলগার। ইউক্রেনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ক্রিমিয়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। অনেক দিন থেকেই এই অঞ্চলের প্রতি রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি। কিছুদিন আগে রাশিয়া আবার হামলা চালায় এই অঞ্চলে। হাজার হাজার তাতার মুসলিম উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

রাশা ও ইউক্রেন বাহিনীর সংঘর্ষের মুখে, নিরস্ত্র তাতাররা অসহায় শিকারে পরিণত হয়। রুশ বোমারু বিমানগুলো এক নাগাড়ে বোমা বর্ষণের ফলে গ্রামকে গ্রাম শূণ্য হয়ে গেছে।

ওলগার গ্রামে অনেকেই এসে আশ্রয় নিয়েছে। অসংখ্য গুরুতর আহত মুসলমান ছোট্ট একটা হাসপাতালে এসে ঠাঁই নিয়েছে। ডাক্তারের স্বল্পতার

কারণে অনেক শিশু ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে। সাইবেরিয়ার কনকনে হাঁড় কাঁপানো হিমেল বাতাসে তুষার উড়ছে, পেঁজা তুলার মতো।

পাশের শহরে নাতালভে একটা মিশনারী হাসপাতাল আছে। সেখানে অনেক ডাক্তার-নার্স আছে। অনেকে কষ্ট করে সেখানে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সবাই সেখানে পারতপক্ষে যেতে চায় না। সেখানে গেলে খৃস্টান ধর্মের অনেক কিছু মেনে চিকিৎসা নিতে হয়।

কিন্তু এই হাসপাতালে একটা শিশুর অবস্থা খুবই করুণ। একনাগাড়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শিশুটির নাম তানিয়া প্রখোভা। মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছে। তানিয়ার কষ্ট দেখে একজন একজন নার্স মিশনারী হাসপাতালে যোগাযোগ করল। মিশনারী থেকে বলা হলো এখনি একজন ডাক্তার পাঠানো হবে।

কয়েক ঘণ্টা পরে একজন ডাক্তার এলেন। সাথে একজন নার্সও এলো। ডাক্তার তানিয়াকে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাকে খুব বেশি আশাবাদী মনে হলো না। বললেন, অনেক রক্ত লাগবে। আশেপাশের অনেকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন। কারো সাথেই রক্তের গ্রুপ মিললো না।

একটা কিশোর এগিয়ে এল। তার নাম মাসুদ ওলিফ। সে বললো:

-আমি রক্ত দিতে চাই।

-তুমি চাইলেই তো হবে না। গ্রুপ মিলতে হবে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন, মিলে গেলো। মাসুদকে পাশের বেডে শুইয়ে দেয়া হলো। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ গাঁথার থেকেই সে ফোঁপাতে শুরু করে দিল। বিড়বিড় করছে। কিছুক্ষণ পরপরই সে কেঁদে উঠছিলো আর অস্পষ্টভাবে কী যেন বলছিলো।

ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করলো:

-খোকা, তুমি কি ব্যথা পাচ্ছো?

এর উত্তরে মাসুদ কী বললো ডাক্তার তার ভাষা বুঝতে পারলো না। ডাক্তার এই হাসপাতালের একজন নার্সকে ডেকে জানতে চাইলেন:

-এই ছেলেটা কি ব্যথা পাচ্ছে?

নার্স মাসুদের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো:

-তুমি কি ব্যাথা পাচ্ছো?

-না।

-তাহলে গোঙাচ্ছ কেন? কোনও সমস্যা অনুভব করছো?

-না। তবে আমার দাদুকে আর দেখতে পাবো না ভেবে খারাপ লাগছে?

-কেন?

-আমি তো এই মেয়েটাকে রক্ত দেয়ার পর মারা যাব, তাই দাদুর কথা ভেবে খারাপ লাগছে?

-রক্ত দিলে মারা যায়, এটা তোমাকে কে বলেছে?

-রক্ত দিলে কেউ মরে না? তাহলে তো ভালই হয়েছে। নাহলে আমার দাদু বড় একা হয়ে যাবেন।

-তুমি মারা যাবে জেনেও রক্ত দিতে রাজি হলে কেন?

-বাড়িতে আমার বৃদ্ধা দাদু আছেন। আব্বু-আম্মু নেই। তিনিই আমাকে বড় করেছেন। গতকালের বোমা হামলায় তিনি খুবই আহত হয়েছেন। বুড়ো মানুষ, হাঁটতে পারেন না। তাই আসতে পারেন নি। আমাকে পাঠিয়েছেন ওষুধ নিয়ে যেতে। আর আসার সময় বলে দিয়েছেন, জীবন দিয়ে হলেও যেন আহতদের সেবা করি।

আমি ফিরে না গেলে দাদু, না খেয়েই মারা যাবেন। আমাদের গ্রামে এখন কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। আমি ভাবছিলাম আমার দাদুকে আর দেখবো না। তাই দাদুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিলাম।

জীবন জাগার গল্প : ৩৭৯

পাগল ও দরবেশ

দুনিয়া তিন দিনের। গতকাল সে তো চলে গেছে। আগামীকাল সেটার নাগাল তো নাও পেতে পারি। আর আজ? হাতে থাকে তাহলে শুধুই আজ। যা করার আজই করে নিতে হবে।

এক পাগল মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার চোখ পড়লো এক দরবেশের ওপর। মসজিদে বসে মুনাজাত করছে আর চোখের পানি ঝরিয়ে কাঁদছে। বারবার দু'আ করছে:

-ইয়া রাব! আমাকে জাহান্নামে দিবেন না। আমার প্রতি দয়া করুন। আমার প্রতি কোমল হোন। ইয়া রহীম, ইয়া রাহমান! আমাকে আযাব দিবেন না। আমি দুর্বল। আমার আগুন সহ্য করার মতো ক্ষমতা নেই, আমাকে দয়া করুন। আমার চামড়া খুবই কোমল, আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে পারবে না,

আমাকে দয়া করুন। আমার হাড়গুলো শক্ত, আগুনের তীব্র হলকা প্রতিরোধ করতে পারবে না, আমাকে দয়া করুন।

দরবেশের এই কাকুতি-মিনতিপূর্ণ মুনাজাত শুনে পাগল হো হো করে হেসে দিল। দরবেশ হাসির আওয়াজ শুনে মুনাজাত শেষ করে, পাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন:

-তুমি হাসছ কেন?

-আপনার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে।

-আমার কোন কথা?

-আপনি আগুনের ভয়ে, আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন।

-কেন তুমি আগুনকে ভয় পাও না?

-নাহ, আমি আগুনকে ভয় পাই না।

-তোমাকে লোকেরা কি এমনি এমনি পাগল বলে?

-দরবেশ সাহেব! আপনার একজন দয়ালু রব থাকতে, আগুনকে আপনি কেন ভয় করেন? তাঁর রহমত তো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

-আমার অনেক পাপ আছে। ন্যায়বিচারক হিসেবে যদি তিনি আমাকে পাকড়াও করেন, অবশ্যই আমার জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই। আমি কাঁদছি, যদি তিনি আমার কান্না দেখে দয়া করেন! আমার পাপ মার্জনা করেন! আমাকে হিসেব ছাড়াই ছেড়ে দেন! তার অনুগ্রহ-দয়া-কোমলতার কারণে যদি তিনি আমাকে ছেড়ে দেন! তাহলে আমাকে আর জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

দরবেশের কথা শুনে পাগল আগের চেয়েও উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

-কী ব্যাপার! আবারও হাসছ কেন?

-আপনার রব ন্যায় বিচারক, আপনি তার ন্যায়বিচারকে ভয় করছেন? আপনার রব অতি দয়ালু, তাওবা কবুলকারী, তা সত্ত্বেও আপনি তার আগুনকে ভয় করছেন?

-তুমি আল্লাহকে ভয় করো না?

-হাঁ করি! কিন্তু আমার ভয়টা তার আগুনকে নয়।

দরবেশ বেশ অবাক হলেন। জানতে চাইলো:

-আগুনকেই যদি ভয় না করো, তাহলে তোমার ভয় কিসে?

-আমি আমার রবের মুখোমুখি হওয়াকে ভয় করি। তার প্রশ্ন করাকে ভয় করি। তিনি যদি জানতে চান:

-বান্দা! কেন তুমি আমার নাফরমানি করেছ?

পাগল আরো বলল:

-আমি যদি জাহান্নামি হই, তাহলে আমার কামনা থাকবে, তিনি যেন আমাকে কোনও প্রকার জেরা না করেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তার জেরার চেয়ে আমার কাছে দোযখের আযাবই বেশি সহজ। এই পাপী চোখ দিয়ে তার দিকে কিভাবে তাকাব? এই মিথ্যুক জিহ্বা দিয়ে কিভাবে তার কথার জবাব দিব? আমাকে আগুনে ফেলে যদি আমার মা'শুক আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমার মোটেও আপত্তি নেই।

দরবেশ এবার আরও অবাক হলেন। কিছু না বলে চুপ করে ভাবতে লাগলেন। দরবেশকে নিরুত্তর দেখে পাগল আবার বললো:

-দরবেশ সাহেব! আমি আপনাকে একটা গোপন কথা বলতে চাই, আপনি কারো কাছে তা ফাঁস করতে পারবেন না।

-কী সেই গোপন কথা?

-হে দরবেশ! আমার রব আমাকে কিছুতেই জাহান্নামে দিবেন না। এর কারণ কি জানেন?

-কেন?

-কারণ আমি সব সময় আমার রবের ইবাদত করেছি তার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ নিয়ে। আপনি তার ইবাদত করেছেন ভয় ও আশা নিয়ে। রবের প্রতি আপনার ধারণার চেয়ে আমার ধারণা উত্তম। রবের কাছে আমার আশা আপনার আশার চেয়ে উত্তম।

তাই আল্লাহর প্রতি আপনার আশাকে উন্নত করুন। মুসা (আ.) গেলেন আগুন আনতে, ফিরে এলেন নবুওয়ত নিয়ে। আমি আমার রবের সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে পাগল হয়ে ফিরে এসেছি।

এই বলে পাগলটা হাসতে হাসতে চলে গেল। পাগলের চলে যাওয়া দেখে দরবেশ কাঁদতে শুরু করে দিল। কান্না থামিয়ে বললো:

-আমি বিশ্বাস করি না, এই লোক পাগল। এ তো জ্ঞানীদের জ্ঞানী। আমিই আসলে পাগল।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮০

ওমরায় পাওয়া 'জামাই-বউ'!

মা মারা গেছেন যখন আমি চৌদ্দ বছরের কিশোরী। আমার ছোট আরও তিনটা ভাই আছে। আব্বু আবার বিয়ে করলেন। নতুন মাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতলেন। ছোটদের দেখবালের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমার কাঁধে বর্তালো। আব্বু মাসিক খরচাটা দিতেন। খোঁজ-খবর রাখতেন। সবকিছু সামলে আমিও লেখাপড়া চালিয়ে গেলাম। ভাইদের লেখাপড়াও চলতে লাগলো। এই করতে করতে মাঝে মধ্যে কয়েকটা বছর ড্রপও দিতে হয়েছে। কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স শেষ করে, যখন বের হলাম, মনে হলো অনেক দীর্ঘ একটা পথ পাড়ি দিয়ে এলাম। সবাই আনন্দে হাসছিল। আমার কেন যেন ক্লান্তি লাগছিল।

•

ভাইদের বিয়ে, নিজের চাকুরির কারণে কখন যে বিয়ের আসল বয়েস পার হয়ে এসেছি, টের পাইনি। প্রস্তাব যে একদম আসে নি, এমন নয়। কিন্তু পছন্দসই না হওয়াতে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এখন দেখা দিল আরেক সমস্যা, বয়েস বেশি। চৌত্রিশ। ভাইয়েরা চেষ্টা করেও সম্বন্ধ আনতে পারছে না। তাদের মনে বিরাট কষ্ট, তাদের জন্যে জীবনের সোনালী দিনগুলো ব্যয় করে, এখন আমার জীবনটা তামাটে হয়ে আছে।

•

আব্বুর সাথে অনিয়মিত হলেও যোগাযোগ ছিল। নতুন সংসার নিয়ে তিনি খুব বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তবুও ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু করেছেন, তাও অনেক। তার অর্থিক সহযোগিতা না পেলে, আমাদের কে কোথায় থাকতো! নতুন মায়ের চোখ বাঁচিয়ে যা করেছেন, তাই ঢের!

•

এতদিন হলো, নতুন মা কখনো আমাদের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখাননি। গত কয়েকদিন ধরে তাকে দেখলাম আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিচ্ছেন। ব্যাপারটা আমাদের বেশ ভাবিয়ে তুললো। ব্যাপারটা খোলাসা হলো কয়েকদিন পর, আব্বু এক ছুটির দিনে, একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন। তিনি সরাসরি দেননি। আমার একমাত্র খালাকে দিয়ে পেড়েছেন।

•

আমার ছোট মায়ের এক নিকটাত্মীয়। খুবই গরীব। লেখাপড়া ও দেখতে শুনতে মোটামুটি গোছের। ছেলেটার একটা অবলম্বন দরকার। ছোটমার কেন যেন মনে হলো, সেটা আমিই হতে পারি। প্রস্তাব শুনে ভাইয়েরা এককথায় নাকচ করে দিলো। আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, আর দেরী করা ঠিক হবে না। কেউ তো রাজি হচ্ছে, একজন রাজি হয়েছে, এটাই বা মন্দ কী! সম্মতি দিয়ে দিলাম। ভাইয়েরা গোমড়ামুখে বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করলো। বিয়ের আর একদিন বাকী। বিনামেঘে বজ্রপাত! হবু বরের পিতা বাগড়া দিলেন। তিনি বললেন:

-পাত্রী তো বুড়ি, একে বিয়ে করলে, আমার ছেলে সন্তানের মুখ দেখবে না। আমিও নাতিপুতি পাবো না! এ বিয়ে হতেই পারে না!

•

শুধু আমি নই, আমার আব্বু পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন। আর বুঝি মেয়েটার বিয়ে হবে না! সবই নিয়তি! মুখ বুজে মেনে নিলাম। স্কুলেও জানাজানি হয়েছিল। মুখ দেখাবার জো রইল না। পাড়ায় বের হওয়াই মরণসম হয়ে গিয়েছিল। টি টি পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তবুও দিন গড়াতে লাগলো। স্কুলে পড়াই। ঘরে এসে ভাগিনা-ভাগ্নিদের সাথে সময় কাটে। ব্যক্তিগত পড়াশোনাও কিছুটা হয়। ধকল কাটিয়ে উঠলাম।

•

আমার ছোট ভাইটা বেশ ধার্মিক হয়েছে। তার বউটাও মাশাল্লাহ ধার্মিক। কুরআনে হাফেযা। তার উৎসাহেই আমি হিফয শুরু করলাম। দশ পারা হয়েছে। ভাইটার খুব ইচ্ছা, ওমরা করতে যাবে। স্কুলের সহকর্মী বললো, তুমিও ভাইয়ের সাথে ওমরা করে আসতে পারো। তোমার একান্ত কিছু বলার থাকলে, দু'আ কবুলের জায়গাগুলোতে আল্লাহর কাছে বলতে পারো। তিনি তো সব জায়গার কথাই শোনেন, তবে একেবারে বায়তুল্লাহতে গিয়ে বললে নিশ্চয়ই আরো বেশি করে শুনবেন!

•

তার কথাটা আমার মনে ধরলো। রাতেই ছোট ভাইকে বললাম:

-আমিও তোর সাথে ওমরায় যেতে চাই!

সে শুনে আকাশের চাঁদ পেলো যেনো। এমনিতে ভাইয়েরা আমার জন্যে কিছু করার জন্যে মুখিয়ে থাকে। তাদের মনের গহীনে বোধহয় চাপা একটা

অপরাধবোধও কাজ করে, আমি তাদের জন্যেই আইবুড়ি হয়ে আছি। আমি অনেকবার তাদেরকে বলেছি, বিয়েশাদি আল্লাহর কাছে। তাকদীরের মুয়ামালা। বান্দার কোনও হাত নেই।

•

শুনেছি বায়তুল্লাহকে প্রথম দেখায় যে দু'আ করা হয়, আল্লাহ অবশ্যই তা হুবহু কবুল করেন। আমি আগেই ঠিক করেছি, কী দু'আ করবো। আল্লাহ আমাকে দু'আটা করার তাওফীক দিলেন। বলতে লজ্জা নেই আমি তাকে বলেছি:

-আল্লাহ গো! আমার একটা ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। যার সাথে আমি দ্বীন ও দুনিয়ার খিদমত করতে পারি। আমার জীবনটাকে আপনার কাজে ব্যয় করতে পারি! আমাকে অনেকগুলো নেকসন্তানের মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন! বয়েস বেশি হয়েছে তো কী, আপনি তো সবই পারেন!

•

যত জায়গায় দু'আ কবুল হয়, সবখানে অসংখ্যবার একই দু'আ করে গেলাম। নবিজীর রওযার পাশে, রিয়াযুল জান্নাহতেও একটা দু'আই বারবার করলাম। সবার জন্যে তো দু'আ করেছি-ই!

ওমরা শেষে ফিরতি ফ্লাইটে উঠলাম। বিমানের যাত্রীদের বেশির ভাগই মিসরী। আমাদের সিটটা তিনজনবিশিষ্ট। আমি জানালার পাশে। ছোটভাই আরেক পাশে। মধ্যখানে অন্য কেউ। একদম লাগোয়া সিটটা পাওয়া যায়নি। আমরা ঠিক করেছি, বলেকয়ে দু'ভাইবোন পাশাপাশি বসবো।

•

প্রায় শেষ সময়ে তৃতীয় যাত্রী এলেন। ভাই তাকে অনুরোধ করতেই তিনি সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। কায়রো বিমান বন্দরে নেমে দেখি পরিবারের সবাই দলবেঁধে আমাদের নিতে এসেছে। এমনকি সম্পূর্ণ চমকে দিয়ে আব্বুও এসেছেন। কী যে ভালো লাগলো! আব্বুর প্রতি ছিঁটেফোটা যা কষ্ট ছিল, নিমেষেই দূর হয়ে গেলো।

•

গাড়িতে উঠতে যাবো, পেছন থেকে জোরে কেউ একজন আমার নাম ধরে জোরে ডেকে উঠলো। চেয়ে দেখি আমার অত্যন্ত প্রিয় বান্ধবী রুকাইয়া। স্বামীও সাথে আছে:

-হাদিয়া! তুই যে আসবি, সেটা জানা ছিল না। যাক দেখা হয়ে গেলো।

-তোর বিমানবন্দরে কেন এসেছিস!

-ওর এক বন্ধুও ওমরা করে আজ আসবে। তাকে এস্তেকবাল করতে আসা। লোকটা থাকে বেলজিয়ামে। মিসর ছেড়েছে সেই কবে। উঠবে আমাদের বাসাতেই!

-ও আচ্ছা!

•

বিদায় নিয়ে পা বাড়াতে গিয়েই দেখি, আমাদের পাশের সিটে বসা ব্যক্তিটাই, রুকাইয়ার কাঙ্খিত ব্যক্তি! লোকটাও কিছুটা অবাক হলো।

•

ভীষন ক্লান্তিতে একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আগামীকাল থেকেই স্কুলে যাওয়া শুরু করবো। কতোদিন আমার প্রিয় ছাত্রীদেরকে দেখি না। তাদের কথা সব সময়ই মনে পড়েছে। আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় মোবাইল বেজে উঠলো। আরে রুকাইয়া!

-এত রাতে?

-রাত আর কোথায়! সবে তো দশটা!

-রাত তোদের কাছে মধুর হতে পারে! আমাদের মতো একার কাছে রাতগুলো তো কোনও বার্তা নিয়ে আসে না!

-যদি বার্তার ব্যবস্থা করি?

-হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথা বল! কেন ফোন করেছিস?

-আগে বল, আমাকে কী দিবি?

-কেন?

-একটা সুসংবাদ আছে!

-বলে ফেল না, কেন মুলো ঝুলোচ্ছিস!

-গতকাল যে ভদ্রলোককে দেখলি, তাকে তোর কেমন লেগেছে?

-তাকে আর কেমন লাগবে? আমি অত ভালো করে তাকাইনি!

কেন?

-আছে আছে! উনি তো কাল বিমান বন্দরে গাড়িতে উঠেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন তোর সম্পর্কে। অবশ্য বিমানেই নাকি তোদের

সম্পর্কে তোর ভাই থেকে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তোর সম্পর্কেও কিছুটা জেনেছেন।

-এম্মা! এতকিছু হয়ে গেলো আর আমি কিচ্ছুটি টের পেলাম না!

-তুই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়েছিস! টের পাবি কী করে? আচ্ছা শোন হাদিয়া! আমি সবকিছু খুলে বলেছি তাকে। উনি এক কথায় রাজি!

-রাজি মানে?

-বিয়ে করতে রাজি! উনি মিসরে এসেছেনও বিয়ে করতে। বয়েসে তোর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ো হবেন। জানি তুই কী ভাবছিস! এতদিন বিয়ে থা করেননি কেন? বলছি রে বলছি!

লোকটাও তোর মতো জন্ম এতীম। ছোটবেলায় বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ এতদূর এসেছে। ফোনে এত লম্বা ইতিহাস বলা যাবে না। তুই বিয়ের পর শুনে নিস! তবে হাঁ, কষ্ট করে মানুষ হয়েছিল তো, তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে বিয়ে করবে না। চাকরি-বাকরি করে যা আয়-রোজগার হবে গরীব শিশুদের পেছনে ব্যয় করবে। এসব নিয়েই এতদিন ছিল। লম্বা একটা ছুটি পেয়ে ভাবলো দেশ থেকে একটু ঘুরে যাবে। যাওয়ার পথে ওমরাটাও সেরে ফেলবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস! ওমরার সময়, একদিন তাওয়াফ করতে করতে, তার চোখে পড়লো এক মিসরী পরিবারের ওপর! প্রায় একগন্ডা ছেলেমেয়ে। বিশাল পরিবার একসাথে তাওয়াফ করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর ছোটাছুটি দেখে, তার মনে হলো ইশ! আমারও যদি এতগুলো সন্তান থাকতো! সাথে সাথেই এতদিনের সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো। বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করতে হবে।

হাদিয়া! তুই অমত করিসনে সই!

-বা রে! যার বিয়ে তার খবর নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই! আচ্ছা মানুষটার কাছে একটা কথা জেনে নিতে পারবি?

-একটা কেন, একশটা পারবো!

-একটু জিজ্ঞেস করিস তো, তার তাওয়াফের সময়টা কখন ছিল?

-একটু লাইনে থাক, এক্ষুণি জানাচ্ছি।

-হ্যালো! লাইনে আছিস!

-আছি!

-তারিখটা ছিল গত সোমবারের আগের সোমবার! আসরের আগে!

-আল্লাহু আকবর!

-কী হলো?

-আমি তখন বায়তুল্লাহকে প্রথম দেখার দু'আ করছিলাম!

•

বিয়ে হলো গেলো। দু'জন মিলে ঠিক করলো, একটা বছর যে যার চাকুরিতে থেকে যাবে। পরে দেখা যাবে কে কার কাছে যাবে। তবে হুসনি মুবারকের যদি পতন হয়ে যায়, আর ইসলামী কোনও দল ক্ষমতায় আসে, তাহলে মিসরেই থাকা হবে। অন্যথায় দু'জনেরই ইচ্ছে, বেলজিয়াম!

•

বিয়ের পর প্রথম দুটো মাস বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যেই কেটেছে। মনে বেশ ভয় ভয় করছিল হাদিয়ার। আল্লাহ একটা দু'আ তো অক্ষরে অক্ষরে কবুল করেছেন। বাকিটাও কি করবেন না! এদিকে স্বামীর ছুটিও দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল।

•

দু'জনে মিলে ঠিক করলো, ডাক্তারের কাছে যাবে। অভিজ্ঞ এক মহিলা ডাক্তারের কাছে গেলো। তিনি দেখেই বলে দিলেন:

-আপনি তো সন্তান-সম্ভবা!

দু'জনের চোখেই তখন আনন্দাশ্রু চিকচিক করছে। ছুটি শেষ হলে স্বামী চলে গেলো। বললো খুব তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে আবার ফিরবে। তার অনেক ছুটি পাওনা আছে।

•

হাদিয়ার মনে সারাক্ষণই নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। আল্লাহ শেষ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় হবে তো! ছয় মাসের পর দেখা গেলো শরীরটা অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন সব ঠিক আছে।

•

নির্দিষ্ট দিনে ক্লিনিকে ভর্তি হলো। যথা সময়ে ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলো। অসম্ভব ব্যাথায় শেষের দিকে হাদিয়া অজ্ঞানের মতো হয়ে গিয়েছিল।

হুঁশ ফিরতেই কর্তব্যরত নার্স দৌড়ে কাছে এলো। হাদিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নার্সের দিকে তাকালো, যেন জানতে চাইলো কাউকে দেখছি না কেন? আমার সন্তান কোথায়? নার্স হেঁয়ালি করে বললো:

-আপনি কী আশা করেন? ছেলে না মেয়ে?

-আমার বিশেষ কিছু চাওয়ার নেই। আল্লাহ যা দিবেন, তাতেই আমি খুশি। বাকিরা কোথায়?

-এই তো এখুনি এসে যাবে। কী নাম ঠিক করেছেন?

-ওর ইচ্ছে হাসান বা ফাতিমা!

-যদি বলি দুটো ঠিক আছে, তবে আরেকটা নাম লাগবে?

নার্সের কথা শেষ না হতেই পাশের কেবিন থেকে একসাথে তিন ভ্রাতৃবধু প্রবেশ করলো। তিনজনের হাতেই তিনটা 'পুতুল'। ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে!

জীবন জাগার গল্প : ৩৮১

মতবাদ পরিচয়!

সমাজতন্ত্র:

আমার কাছে দুইটা গাভী আছে। আইনের কারণে একটা গাভী দিয়ে দিতে হলো দরিদ্র গাভীহীন প্রতিবেশিকে। আমার কাছে থাকা গাভীটাকে আরও বিশজন মানুষের সাথে ভাগাভাগি করতে হলো। দুধ যা পাই সরকারী ভাঁড়ে জমা রাখতে হয়। তারপর গুঁতোগুঁতি- ঠেলাঠেলি করে লাইনে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে সরকারী বরাদ্দ যতকিঞ্চিৎ দুধ সংগ্রহ করি। সে দুধে না পেট ভরে, না পিঠ ভরে।

সাম্যবাদ:

আমার কাছে দুইটা গাভী আছে। সরকার দুটোই নিয়ে নিয়েছে। আমার কাজ হলো ও দুটোকে খড়বিচালি খাওয়ানো। দুধ দোহন করা। চড়াদামে দুধটা উন্নত বাজারে বিক্রি করা। তারপর টাকাটা জমা হবে সরকারি ফান্ডে। সরকার দয়া করে আমাকে সামান্য কিছু টাকা দিবে। যৎসামান্য সে টাকা দিয়ে আমি খোলা বাজার থেকে তিন নম্বরী পঁচা দুধ কিনে বাড়ি ফিরবো। সে দুধ পান করে পরিবারের সবাই রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা পড়বে।

•

ফ্যাসিবাদঃ

আমার কাছে দুইটা গাভী আছে। সরকার দুটোই ছিনিয়ে নেবে। এরপর আমাকে মাটিতে শুইয়ে অতীত জীবনে যত দুধ খেয়েছি সেটা শরীর থেকে দোহন করে নিবে!

•

পুঁজিবাদঃ

আমার কাছে দুইটা গাভি আছে। সরকারি লোকেরা এসে গাভী দুটোর ওপর চড়া ট্যাক্স ধার্য করবে। ট্যাক্স আদায় করতে না পেরে একটা গাভী বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবো। সেটা কিনে নিবে এক ধনকুবের। যে নিজে কখনো ট্যাক্স দেয় না। ধনী লোকটা একে একে বাজারের সব গরু কিনে নিবে। তারপর বাজারে চড়া মূল্যে দুধ বিক্রি করতে শুরু করবে।

আমি গরু বেচা টাকা দিয়েও দুধ কিনতে না পেরে দ্বিতীয়টাও বিক্রি করে দিবো। এবার সেই মাড়োয়ারি দুধের দাম আরও বাড়িয়ে দিবে। অল্প কিছু মানুষই শুধু দুধ কিনতে পারবে। আমার মতো যারা মধ্যবিত্ত ছিলো, তারা এক ধাক্কাতেই দরিদ্র হয়ে যাবে। দিনদিন দারিদ্র বেড়েই চলবে। এভাবেই একদিন ক্ষুৎপিপাসায় আমরা দরিদ্র শ্রেণী মারা পড়বো।

•

ইসলামঃ

আমার কাছে দুইটা গাভী আছে। আমার গাভী আমিই লালন-পালন করি। খলীফাও এটাই করতে বলে। দুধ দোহন করে বাজারে বিক্রি করি। দামও খারাপ আসে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু দুধ যাদের গরু নেই তাদেরকে দান করি। দুধ বিক্রি করে যা পাই, পরিবারের জন্যে খরচ করি। কিছু টাকা জমেও যায়।

বছর শেষে খলীফার 'আমিল' এসে হিসেব কষে দেখে, জমা টাকা যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয়েছে কি না। হলে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত পরিমাণ মতো যাকাত উসূল করে চলে যায়। সে-টাকা খলীফা সুষমভাবে বণ্টন করে দেন।

যাদেরকে এ-বছর সাদকা করেছিলাম, পরের বছর তাদেরকে দান করতে গিয়ে লজ্জা পাই, কারণ তারাও ইতোমধ্যে খিলাফতের সহযোগিতায় নিজেই নেসাবের মালিক হয়ে বসেছে। কিন্তু যাকাত দান করার মতো গরীব খুঁজে পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে অন্য দেশে টাকাটা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স
মা
প্ত